স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা

১৫ আগষ্ট - ২০১১, ২৯ শ্রাবণ - ১৪১৮ ।।
৬৩ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা

১৯৪৭

১৫ই আগষ্টের সেই দিন....

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

আনন্দমার্গীদের নৃশংস হত্যা : তদন্ত কমিশন গঠনে

মমতার প্রতিশ্রুতি কি হলো? ❑

ডান-বাম দু'শিবিরেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একই দৃশ্য ❑

ইসলামের পথে ভারত-পশ্চিমবঙ্গ : সাচারের পরামর্শ ❑

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❑

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদই জাতীয় নিরাপত্তার এক নম্বর সমস্যা ❑

ডঃ সুব্রমানিয়ান স্বামী ❑

অখণ্ড ভারতের সাধনা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑

অখণ্ড ভারতের ভাবনা ও কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ❑

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑

কেন স্বাধীনতা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ হয়েছিল? ❑ শিবাশীষ রায়চৌধুরী ❑

মুরারিপুকুর আখড়া : শ্রীঅরবিন্দ, সনাতন ধর্ম ও ভারত-উত্থান ❑

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর ❑

ভগৎ সিং : ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লববাদের প্রতীক ❑

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ❑

রক্তের ঋণ রক্ত দিয়েই শোধ করতে হয় ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑

ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে আলোড়িত 'তোতারাম' ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ পরম্পরা : ❑ নবাঙ্কুর : ❑ কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা : ❑

সমাবেশ-সমাচার : ❑ চিঠিপত্র : ❑ চিত্রকথা :

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

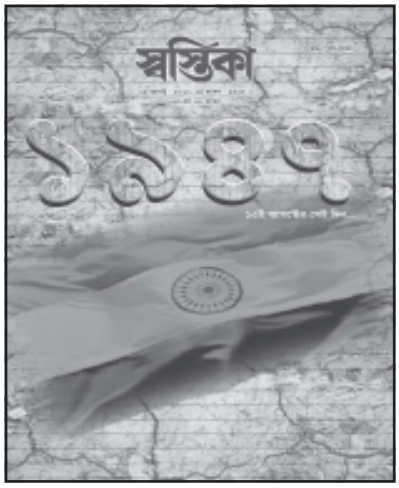

১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট — ১৫-২৩

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২৯ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৫ আগষ্ট - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির দায় প্রধানমন্ত্রীরও

লোকসভায় লোকপাল বিল পেশ হইয়াছে। যে বিলটি পেশ হইয়াছে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে এর আওতার বাইরে রাখা হইয়াছে। সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি রুখিতে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাহাতে লোকপাল কাজ করিতে পারে তাহার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা এই খসড়া বিলে নেই বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশেষত প্রধান বিরোধী দল বিজেপি, অন্যান্য বিরোধী দলগুলিসহ আন্না হাজারের সমর্থক সজ্জন সমাজও প্রধানমন্ত্রীকে এই বিলের আওতায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের এই দাবী যে অমূলক নয় বর্তমান ইউপিএ সরকারের কাজকর্মের দিকে তাকাইলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বস্তুত আমরা এমন একটি সরকারের অধীনে বাস করিতেছি, যাহারা দুর্নীতিতে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই সর্বোচ্চ স্তরে একটার পর একটা নতুন দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িতেছে। বর্তমান ইউপিএ সরকার সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতির সঙ্গে সমার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ গেমস, আদর্শ আবাসন ইত্যাদি দুর্নীতির অভিযোগগুলি তো রহিয়াছেই। এই সূত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমানে কারাগৃহে রহিয়াছেন। কমনওয়েলথ গেমস দুর্নীতি লইয়া ইতিমধ্যেই সংসদে পেশ করা সিএজি রিপোর্টে দিল্লী রাজ্য সরকার ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলির জড়িত থাকার ঘটনা উন্মোচিত হইয়াছে। সাধারণ এইরকম ক্ষেত্রে দায়িত্ব লইয়া তদন্তের স্বার্থে পদত্যাগ করা হয়। যেমন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লী সরকারের পক্ষে কোনও হেলদোল নাই। সম্প্রতি আবার সি এ জি (ক্যাগ)-এর পক্ষ হইতে যে খসড়া রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় গ্যাস চুক্তি লইয়াও বিশাল পরিমাণ দুর্নীতির চিত্র সামনে আসিয়াছে। এই গ্যাস চুক্তির বিষয়ে ২০০৮ সাল হইতে বিরোধী পক্ষ হইতে কী ঘটিতেছে তাহার বিবরণ দিয়া প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! প্রধানমন্ত্রী কিছুই করেন নাই। ঘটনা হইল, রাজীব গান্ধী বা নরসিংহ রাও সরকারের আমলে একটার পর একটা দুর্নীতি হইয়াছে, কিন্তু সোনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পরিচালিত মনমোহন সিং-এর ইউ পি এ সরকারের আমলে দুর্নীতির পরিমাণ সব সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। বিশেষত ২-জি এবং কে জি বেসিনের ঘটনায় কি ঘটিতেছে প্রধানমন্ত্রী তাহার পুরোটাই জানিতেন, কিন্তু সেইসব অন্যায় কাজ তিনি থামান নাই। প্রধানমন্ত্রীকে এই দুর্নীতিরাজের দায়িত্ব তাই গ্রহণ করিতেই হইবে। স্বাধীনতার পর হইতে সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের শীর্ষে তিনি রহিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ব্যক্তিগত সততা লইয়া সোনিয়া কংগ্রেস যে প্রচার চালাইতেছে তাহা কোনও কাজের কথা নয়। সরকারের উচ্চ পদে দুর্নীতি কোনও ব্যক্তিগত সততা-অসততার বিষয় নয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী সৎ হইতেই পারেন। কিন্তু কথা হইল, তাঁহার নেতৃত্বে যাহারা সরকার চালাইতেছে, তাহারা যদি দুর্নীতিবাজ হয়, চোর হয়, ধর্ষক হয়, নীতিহীন হয়, তাহা কোনও মতেই বরদাস্ত করা যাইবে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে এই অবস্থা কখনও চলিতে পারে না। তাই এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক, সর্বোচ্চ স্তরে এইসব ভয়াবহ দুর্নীতির কে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন? প্রধানমন্ত্রী একজন সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু সব জানিয়া শুনিয়াও তিনি এইসব দুর্নীতি রুখিতে কোনও পদক্ষেপ এযাবৎ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। লোকপাল বিলের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর পদকে আনিতেই হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে! সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনা শক্তি একান্ত ব্যাপৃত সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন যাত্রার আদেশে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমানকালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিতকালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থ প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড় জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে—তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু হিন্দুদের ধর্মস্থানের জন্য এত আইনের বাড়াবাড়ি কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এখন অনেকের মনে একটা প্রশ্ন বার বার উঁকি দিচ্ছে, আইনের সমস্ত কড়াকড়ি কি হিন্দুদের ধর্মস্থানের জন্যে? কারণ এই ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনা বা প্রার্থনাস্থল রয়েছে সেসব জায়গায় তো বিশেষ নজরদারির ব্যাপার থাকছে না! হিন্দু মন্দিরের মধ্যে কি কি লুকানো আছে তা জানার জন্যে অনেক আইনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সংবিধানে ফলাও করে বলা হয়েছে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মচর্চার স্বাধীনতা থাকবে। কোনওরকম ব্যাঘাত ঘটানো হবে না কোনও জায়গায়। ধর্মস্থানের উপর জঙ্গি আক্রমণ হয়েছে। স্বর্ণমন্দির তো একসময় খালিস্তানিদের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং পরিকল্পনা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অনেক মসজিদেও প্রচুর পরিমাণ নানারকম অস্ত্র মজুদ রয়েছে। এবং সেসব অস্ত্রের কোনও আইনি ছাড়পত্রও নেই। আমরা জানি, কোনও হিন্দু মন্দির অস্ত্রাগার হয়ে ওঠেনি। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনও মন্দিরের নিরাপত্তার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বেতনভুক রক্ষী। মন্দির থেকে বাইরে কোনও আক্রমণের ছক তৈরি হয়নি। বেশিরভাগ মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয় সারাবছর ধরে। ভক্তরা ডালি সাজিয়ে পুজো দেন, প্রণামী দেন। অনেকে মনস্কামনা পূরণের জন্যে দেবদেবীর জন্যে বহুমূল্য অলঙ্কার দেন। সেসব জমা পড়ে মন্দিরের কোষাগারে। সব লেখাজোখা থাকে। কারণ দেবতার নামে উৎসর্গ করা জিনিস সযত্নে রক্ষা করা মন্দিরের পরিচালকদের অন্যতম কাজ। হিন্দুমন্দিরে ওইভাবে বহু বছর ধরে সঞ্চিত হয়েছে সম্পদ। গুজরাটের সোমনাথ মন্দির দু'একবার নয়, সতেরো বার লুঠ করেছিল সুলতান মামুদ। শুধু সঞ্চিত সম্পদ লুঠ-ই উদ্দেশ্য ছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল হিন্দুবিদ্বেষ। 'ওরা কাফের। ওদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে দাও।' নিছক লুণ্ঠনের মতলব থাকলে মসজিদও বাদ যেত না। সবটাই ছিল মতলবি কাণ্ড। দস্যু আক্রমণ ঘটতে পারে এমন অনুমান করে মন্দিরের গোপন কক্ষ ছিল। আর তার হদিশ জানা থাকত শুধু কয়েকজনের। এরকম গোপন ব্যবস্থা না থাকলে অবাধ লুঠপাট হোত মন্দিরে। কারণ লোভে অনেকেরই চোখ চকচক করে। খোলামেলা ব্যাপার থাকলে প্রলুব্ধ হয়ে কেউ কেউ কুকর্ম করতে পারে। সম্পদের লোভ প্রবল হলে ধর্মভয় উবে যায়। এসব ভেবেই নানারকম বিধিনিয়ম আর

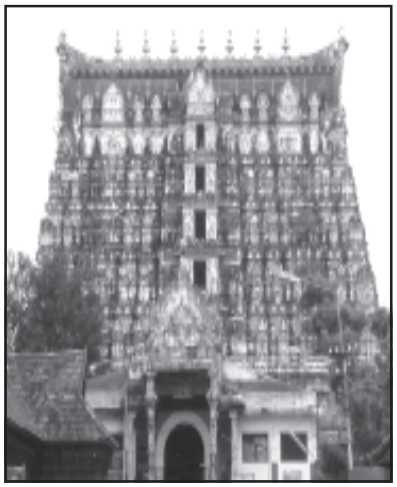

পাহারার মাধ্যমে মন্দিরের সম্পদ রক্ষার চেষ্টা। ওইভাবে অনেক মন্দিরের সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরে সঞ্চিত সম্পদের দিকে সরকারি লোকজন নজর দিচ্ছে। কোনও কোনও মন্দির সরকার অধিগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

কেরলের পদ্মনাভ মন্দির গতবছর সেখানকার বামপন্থী সরকার দখলে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন নেতা আপত্তি জানিয়ে বলেন, এমন কাজটি করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে। কিন্তু মন্দির দখলের চিন্তা সরকার ছাড়েনি। তিরুঅনন্তপুরমের পদ্মনাভ মন্দির বিশাল। সেখানে বিপুল পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে— এটা অনুমান করে রাজ্য সরকারের মন্দিরচিন্তা প্রবল হয়েছে। তা কি মন্দিরের মঙ্গলের জন্যে, না সরকারের কয়েকজনের ব্যক্তিগত মঙ্গল ভাবনায়?

কয়েকজন শুভচিন্তক পরামর্শ দিয়েছেন, 'মন্দিরের সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে সর্বজনীন মঙ্গলকাজে ব্যয় করুক'। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইসব প্রস্তাব খারিজ করে বলেছেন, 'ধর্মমন্দিরের সম্পত্তি ধর্মস্থানেই থাকবে। সরকার তা নেবে না।' ভারতীয় জনতা পার্টি আগাগোড়া এই কথাই বলে আসছিল।

সুপ্রিম কোর্ট যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে এই ব্যাপারটার দিকে নজর দেয় এবং স্পষ্টভাবে জানায় যে পরম্পরার মর্যাদা আইনের উপরে। এসবই মন্দিরের সম্পদ। গুপ্তধন নয়। মন্দিরের সম্পদকে গুপ্তধন ভাবার মধ্যে অত্যন্ত হীন প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। যার মধ্যে পাওয়া যায় মধ্যযুগের লুঠেরার ছাপ। বিদেশি ডাকাতরা হিন্দুদের ধর্মস্থানে আক্রমণ চালিয়েছিল লুঠের উদ্দেশ্যে।

মন্দিরের মধ্যে এত সম্পদ কেন? আসলে তখন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা ছিল না। মন্দিরের মধ্যেই তা রক্ষা করা হোত। পদ্মনাভ মন্দিরের সম্পদের খবর লুঠেরা পায়নি বলে তো নিরাপদে ছিল এতকাল। সমুদ্রতটে সাত একর জায়গা জুড়ে এই মন্দির। জানা যায় পাশের রাজ্য মহীশূরের হায়দর আলি ও টিপু সুলতান কয়েকবার লুঠের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা নিজেকে বিষ্ণুদাস মনে করতেন। মন্দিরের সবকিছু দেবতার। রাজা হিসেবে তাঁর কাজ মন্দির রক্ষা করা। রাজা জানতেন মন্দিরে কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু কখনও তা নিজের কাজে লাগাবার কথা ভাবেননি। এখনও রাজ পরিবার কালো মরিচের ব্যবসা করে সব খরচ সামলায়। কালো মরিচ বিদেশে যায়। ভালো দাম মেলে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা বরাবরই প্রগতিশীল। তাঁদের দূরদৃষ্টি প্রবল ছিল। নিজেদের রাজ্যে অনেকরকম উন্নয়নের কাজ করেছেন। এক রাজা ১৯৩৬ সালে দলিতদের মন্দিরে ঢোকার অধিকার দেন ঘোষণা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চক্রবর্তী রাজা গোপলাচারী ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের মহারাজা চিচিরা তিরুনালকে সংযুক্ত মাদ্রাজের রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব দেন। মহারাজ জানান, আমি তিরুঅনন্তপুরম থেকে দূরে মাদ্রাজ শহরে কীভাবে থাকবো। আমাকে তো ভগবান বিষ্ণুর দর্শন রোজ করতে হয়।' এই পরম্পরা রয়েছে রাজ পরিবারে। সৎচরিত্রের নির্লোভ মানুষ তাঁরা। সেজন্যে জনসমর্থনও পেয়েছেন বরাবর। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরাও মহারাজার প্রশংসা করে মুক্তকণ্ঠে। তার মধ্যেও কিছু লোভী মানুষ মন্দিরের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করে যথেষ্ট গালমন্দ শুনেছে। উপহাসের পাত্র হয়েছে। কারও কারও প্রস্তাব ছিল, মন্দিরের সম্পদ কোনও জনহিতকর কাজে ব্যয় হোক। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে, দেখা যাবে। উন্নতি বা কল্যাণ অনেক দূরে। অর্থ আত্মসাৎ করছে কয়েকজন। কেউ কেউ বলেছেন দেশের সব ধর্ম যখন সমান তখন মুসলমানদের ধর্মস্থানের সম্পদের হিসেব ঠিকভাবে নেওয়া হবে না কেন? সেসব জায়গাতেও হয়তো রয়েছে অনেক কিছু।

অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত মালদা, মুর্শিদাবাদ ভারত-বিরোধী কাজের মুক্তাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুম্বাইয়ে সাম্প্রতিক ১৩/০৭-এর বিস্ফোরণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ আরও একবার প্রমাণ হলো সংশয়াতীতভাবে। গত ৪ আগস্ট মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরক তৈরিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সরবরাহের অভিযোগে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করল জাইরাত শেখকে। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কোর্টে তোলা হয় পরদিনই। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুলাই মুম্বাইয়ে দাদার, জাভেরি বাজার এবং অপেরা হাউসের বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছিল । সুতিতে নিজের গ্রাম থেকে জাইরাত ধরা পড়ার পরে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের মাটিকে বাংলাদেশীদের ভারত-বিরোধী কাজে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য অভিযোগের আঙুল উঠছে বিগত বাম সরকারের দিকেই।

জাইরাতকে গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করলেও প্রথমে জেলা-পুলিশ এনিয়ে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। গোয়েন্দা কুকুর দিয়ে অনুসন্ধান করে দিল্লী পুলিশের দুই আধিকারিক খোঁজ পান জাইরাতের। মধ্য ত্রিশের কুখ্যাত অপরাধী জাইরাত আদতে বিস্ফোরকের ডিলার। ওই আধিকারিকরা তার কাছ থেকে বিস্ফোরণের মাল-মশলা কেনার কথা বলে টোপ ফেলেন। গত ৩ আগস্ট পুলিশ কুকুর নিয়ে গোয়েন্দারা সুতির নতুনচন্দ্র গ্রামে পৌঁছোন ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কিনতে চান। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁদেরকে জাইরাতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। জাইরাতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হলে জাইরাত তাদের 'হাই কোয়ালিটি' মাল দেখাতে উদগ্রীব ছিল। এহেন 'কাস্টমার'রা 'চূড়ান্ত গোপনীয়তা' অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'যে কোনও মূল্যে' তার মাল কিনতে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করায় জাইরাত গোয়েন্দাদের ফাঁদে পা দিয়ে বসে। পরদিন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিয়ে তাঁদের কাছে মাল বেচতে আসলে বমাল ধরা পড়ে সে। গোয়েন্দা'রা অবাক হন, নিজের গ্রামে বহুদিন ধরেই জাইরাতের বিস্ফোরকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান বেচার বে-আইনী কারবারের কথা গ্রামের আর-পাঁচজনে জানলেও এবং এই অবৈধ ব্যবসা রমরমিয়ে চললেও স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন এব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল। জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও অনির্বাণ রায় মেনে নেন, জাইরাতকে ট্রানজিট রিমান্ডে আদালতে হাজির করানোর পর গোটা ব্যাপারটা তাঁদের নজরে আসে।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন নির্বাচনের আগে স্থানীয় গুণ্ডাদের বোমা তৈরির বিস্ফোরক যে জাইরাতই যোগান দিয়ে থাকে একথা কারুর এমনকী পুলিশেরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু জাইরাত যে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও নিত্য-নৈমিত্তিক ওঠা-বসা করে একথা তাঁরা জানতেন না বলেই গ্রামবাসীদের দাবি।

তবে আরেক অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত জেলা মালদা'র কালিয়াচক থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সেলিম খানকে জাল নোট পাচারের অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করে পুলিস। তার সঙ্গে একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের গোপন যোগসূত্রের হদিশ পেয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর তাকে নিজেদের হেপাজতে নেয় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। জেরা করার পর জানা যায় কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সৈয়দ সালাউদ্দিনের পাক জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের উত্তরবঙ্গ লিঙ্কম্যান হিসেবে কাজ করত সে। তার সক্রিয় যোগাযোগ ছিল বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলার মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দু'টি যে সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের নিরাপত্তায় তা আরও ভয়াবহ ধরনের বিপদ সৃষ্টি করবে বলেই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

সীমান্ত জেলাগুলিতে সিমি নানা নামের আড়ালে কাজ করছে

সংবাদদাতা : মালদা ॥ রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলিতে বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদ দুই মুসলিম অধ্যুষিত জেলাতে সম্প্রতি নিষিদ্ধ সিমি সংগঠন বিভিন্ন ছদ্মনামে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে গোপনে বিভিন্ন মাদ্রাসাতে উগ্র ধর্মীয় সংগঠন মজবুত করছে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলিতে একদিকে যেমন বিদেশী মৌলবীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি প্রকাশে গোহত্যা এবং ধর্মীয় জলসার সংখ্যাও বাড়ছে। মালদা জেলার

বাবরী মসজিদ রায় ঃ বিচারের নামে প্রহসন

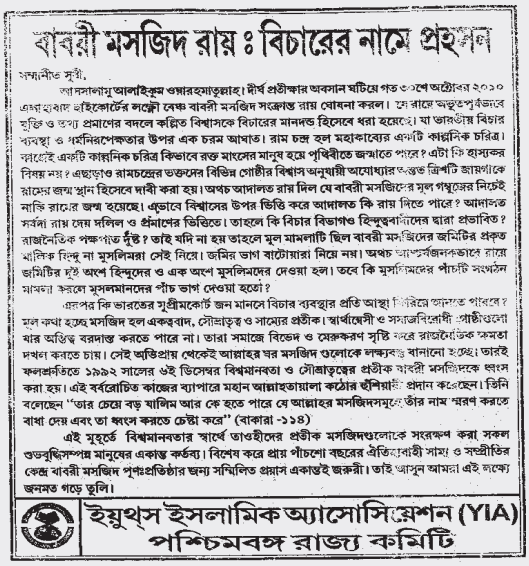

সম্মানীত সুধী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ৩০শে অক্টোবর ২০১০ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত রায় ঘোষনা করল। যে রায়ে অভূতপূর্বভাবে যুক্তি ও তথ্য প্রমাণের বদলে কল্পিত বিশ্বাসকে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। যা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর এক চরম আঘাত। রাম চন্দ্র হল মহাকাব্যের একটি কাল্পনিক চরিত্র। কাজেই একটি কাল্পনিক চরিত্র কিভাবে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতে পারে? এটা কি হাস্যকর বিষয় নয়? এছাড়াও রামচন্দ্রের ভক্তদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশ্বাস অনুযায়ী অযোধ্যার অন্তত ত্রিশটি জায়গাকে রামের জন্ম স্থান হিসেবে দাবী করা হয়। অথচ আদালত রায় দিল যে বাবরী মসজিদের মূল গম্বুজের নিচেই নাকি রামের জন্ম হয়েছে। এভাবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আদালত কি রায় দিতে পারে? আদালত সর্বদা রায় দেয় দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে। তাহলে কি বিচার বিভাগও হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা প্রভাবিত? রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট? তাই যদি না হয় তাহলে মূল মামলাটি ছিল বাবরী মসজিদের জমিটির প্রকৃত মালিক হিন্দু না মুসলিমরা সেই নিয়ে। জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নয়। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে রায়ে জমিটির দুই অংশ হিন্দুদের ও এক অংশ মুসলিমদের দেওয়া হল। তবে কি মুসলিমদের পাঁচটি সংগঠন মামলা করলে মুসলমানদের পাঁচ ভাগ দেওয়া হতো?

এরপর কি ভারতের সুপ্রীমকোর্ট জন মানসে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে? মূল কথা হচ্ছে মসজিদ হল একত্ববাদ, সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রতীক। স্বার্থান্বেসী ও সমাজবিরোধী গোষ্ঠীগুলো যার অস্তিত্ব বরদাস্ত করতে পারে না। তারা সমাজে বিভেদ ও মেরুকরণ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়। সেই অভিপ্রায় থেকেই আল্লাহর ঘর মসজিদ গুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিশ্বমানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক বাবরী মসজিদকে ধ্বংস করা হয়। এই বর্বরোচিত কাজের ব্যাপারে মহান আল্লাহতায়ালা কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করে" (বাকারা -১১৪)

এই মুহূর্তে বিশ্বমানবতার স্বার্থে তাওহীদের প্রতীক মসজিদগুলোকে সংরক্ষণ করা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে প্রায় পাঁচশো বছরের ঐতিহ্যবাহী সাম্য ও সম্প্রীতির কেন্দ্র বাবরী মসজিদ পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস একান্তই জরুরী। তাই আসুন আমরা এই লক্ষ্যে জনমত গড়ে তুলি।

ইয়ুথ্‌স ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন (YIA)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ইংলিশবাজার, সুজাপুর, কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল প্রভৃতি এলাকাতে কিছুদিন আগে সিমি ছাত্রদের মধ্যে ইয়ুথস ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন (YIA) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। তারা "বাবরী মসজিদ রায় : বিচারের নামে প্রহসন" বলে একটি লিফলেট গোপনে মুসলিম যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। এই রমজান মাসে তারা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে টাকা তুলে বিভিন্ন জেলাতে যুবকদের জমায়েত এবং অফিস গড়ে তোলা হবে। জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতেই এই সংগঠনের কাজ বাড়ছে বলে জানা গেছে। এই বর্ষার সময় বাংলাদেশ সীমান্তের নদী দিয়ে গোরু পাচারের কাজে একশ্রেণীর মুসলিমরা যুক্ত আছে এবং বাংলাদেশ জেহাদী সংগঠনের সঙ্গে এই সব নিষিদ্ধ ভারতীয় সংগঠনগুলি যোগাযোগ রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বাংলাদেশী সিম ব্যবহার করে এইসব দেশ বিরোধী সংগঠনগুলি ফুলে ফেঁপে উঠলেও গোয়েন্দাদের বা বি এস এফ তেমন ভাবে মোকাবিলা করতে পারছে না। আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটি এক বিপদ সঙ্কেত।

আনন্দমার্গীদের নৃশংস হত্যা

তদন্ত কমিশন গঠনে মমতার প্রতিশ্রুতি কি হলো ?

গূঢ়পুরুষের
কলম

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো অতীতের গণহত্যার ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। মমতা তাঁর নির্বাচনী প্রচারের সময় একাধিক প্রচার সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে ক্ষমতায় এলে তিনি সর্বপ্রথম

নিহত ১৭ জন আনন্দমার্গী সাধকের আত্মার শান্তি কামনায় আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীরা (ফাইল চিত্র)।

আনন্দমার্গের ১৭ জন সাধকের নৃশংস হত্যার ঘটনার জন্য অপরাধীদের শাস্তি দিতে তদন্ত কমিশন বসাবেন। গত ২১ জুলাই চারটি এবং তার আগেই হত্যার ঘটনার দুটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের ঘোষণা করলেও তিনি এ পর্যন্ত আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী- সন্ন্যাসিনীদের হত্যার তদন্তের জন্য কোনও বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনের ঘোষণা করেননি। অথচ নৃশংস হত্যার বিচারে এই ঘটনাটি ছিল বিরলতম। প্রকাশ্য দিবালোকে দক্ষিণ কলকাতার জনবহুল এলাকায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ১৭টি তরতাজা মানুষকে গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার দ্বিতীয় নজির পশ্চিমবঙ্গে নেই। গুজরাতের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় অযোধ্যা ফেরৎ করসেবকদের একই কায়দায় পুড়িয়ে হত্যার নৃশংসতম ঘটনাটি না ঘটলে বলতে পারতাম কলকাতার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের হত্যাই সারা ভারতে বেনজির ঘটনা। অবাক লাগে যখন দেখি সেই নৃশংস হত্যার সমর্থনকারী সিপিএম নেতারা এখন চিৎকার করছেন তাঁদের দলের কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলী সন্ত্রাসের শিকার। রাজনৈতিক হত্যার কু-শিক্ষা তো কম্যুনিস্টরাই শিখিয়েছে। সিপিএম, নকশাল বা মাওবাদীরা কি কম্যুনিস্ট নয়? শিয়া এবং সুন্নীরা কি মুসলমান নয়? বৈষ্ণব এবং শাক্তরা কী হিন্দু নয়? বড় জোর বলতে পারেন তাঁদের ধর্মীয় সাধন পদ্ধতি পৃথক। ঠিক তেমনই সমস্ত কম্যুনিস্টরাই মার্কসবাদী। শুধু মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা পৃথক পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে। ইসলামে যেমন আল্লার একমাত্র সর্বময় অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই, মার্কসবাদে তেমনি সর্বহারাদের পার্টির একনায়ক শাসনে অবিশ্বাসীদের 'গণশত্রু' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 'গণশত্রু' জনগণের বেঁচে থাকার অধিকারই নেই। তাই কম্যুনিস্টরা অ-কম্যুনিস্টদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সরল পদ্ধতিতে আস্থা রাখে। কারণ, এই জাতীয় হত্যায় জনগণের মধ্যে যতটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায় ততটা গুলি করে গণশত্রু নিধনে হয় না।

আনন্দমার্গের সাধুদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাটি ঘটে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল সকালে। ঘটনাস্থল, দক্ষিণ কলকাতার বিজন সেতু। কলকাতার বাইরে থেকে আসা আনন্দমার্গের ১৬ জন সাধু এবং একজন সন্ন্যাসিনী হাওড়া থেকে ট্যাক্সিতে তাঁদের আশ্রমে যাচ্ছিলেন। সিপিএমের জল্লাদরা বিজন সেতুর উপর ট্যাক্সি থামিয়ে তাঁদের টেনে হিঁচড়ে নামায়। অতি ব্যস্ত বিজন সেতুতে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে চলে গণ প্রহার। তারপর সেই অর্ধমৃত ১৭ জনের দেহে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেদিনের সেই ভয়াবহ গণহত্যার নেতৃত্বে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার তৎকালীন সিপিএম বিধায়ক। পরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে মৃত্যু হয় তাঁর। আলিমুদ্দিনের শক্ত নেতা ও জোতি বসুর প্রিয় পাত্র বিধায়কের উপস্থিতির জন্য পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। বিজন সেতুর গণহত্যার তদন্ত হয়নি। বিচার হয়নি। আজ পর্যন্ত দোষীদের চিহ্নিত করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাই কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে হত্যার ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিচারের একটা প্রহসনও হয়। কিন্তু বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের সাধুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনার পুলিশী তদন্তটুকুও হয়নি। প্রয়াত জ্যোতি বসু বিধানসভায় দম্ভভরে বলেছিলেন, ''ওরা সব সমাজবিরোধী। মড়ার খুলি নিয়ে ঘোরে। কীসব নাচটাচ করে...।'' জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেববাবুরা আনন্দমার্গীদের সমাজবিরোধী বলে মনে করেন। সেই কম্যুনিস্টদের উৎখাতকারিণী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কী তাই মনে করেন? আনন্দমার্গের সাধুদের নৃশংস হত্যার ঘটনার তদন্তে নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগ করে তিনি বার্তা দিন যে সিপিএম ঘাতকদের ক্ষমা করা হবে না।

ডান-বাম দু'শিবিরেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একই দৃশ্য

নিশাকর সোম

এরাজ্যে দুই শিবির অর্থাৎ সিপিএম এবং তৃণমূল শিবিরে চলেছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। সিপিএমের রাজ্যনেতাদের প্রতি সাধারণ কর্মীদের আস্থা তলানিতে ঠেকে গেছে। এই রাজ্যনেতৃত্বের পক্ষে পার্টিকর্মীদের উৎসাহিত করা কখনওই সম্ভব হবে না। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু একক ভাবেই জেলায় জেলায় জেলা কমিটির সভা করছেন, জেলার

পার্টিসভ্যদের সাধারণ সভা অর্থাৎ জেনারেল বডিতে বক্তৃতা করছেন। তিনি যা বলছেন— ''জেলা নেতৃত্বের ভুল রিপোর্ট পাঠানো, পার্টিসদস্যদের জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, ২০ থেকে ২২ শতাংশ পার্টি সদস্যদের সক্রিয়তা, পার্টির সারাক্ষণের কর্মীরা পার্টিসদস্যদের লেভি আদায় করে সভ্যপদ নবীকরণ করাচ্ছে।'' এই কথার অর্থ হলো সারাক্ষণের কর্মীরা নিজেদের ভাতা পাবার স্বার্থে এবং সম্মেলনে ভোট পাবার স্বার্থে কাজ করে চলেছেন। বিমানবাবুকে আজ রাজ্য-কমিটির সদস্যগণ এবং বেশিরভাগ জেলা-কমিটি পাত্তাই দিচ্ছে না। বিমানবাবু জেলা-কমিটির রিপোর্টকে 'অশ্বডিম্ব' বলে উপহাস করেছেন। বিমানবাবু আরও বলেছেন, 'সর্ষের মধ্যে ভূত' অর্থাৎ পার্টিসদস্য কর্মীদের মধ্যেই তৃণমূলী কর্মী রয়েছে— যাঁরা পার্টির ভিতরে অন্তর্ঘাত চালিয়েছে, ভোট দেয়নি। বিমানবাবু তাঁর লেখায় বলেছেন যে ৩৪ বছর আগে সালকিয়া পার্টির কেন্দ্রীয় প্লেনাম গৃহীত সাংগঠনিক ব্যবস্থা কখনওই কার্যকর করা হয়নি। এর অর্থ হলো তাঁর পূর্বসূরী সরোজ মুখার্জি, শৈলেন দাশগুপ্ত এবং অনিল বিশ্বাস ব্যর্থ। বিমানবাবু ঘনিষ্ঠমহলে বলেছেন, ''অনিল বিশ্বাস-এর আমল থেকেই পার্টিতে দলাদলি এবং সাংগঠনিক ব্যাপারে কঠোরতা হ্রাস হয়ে গিয়েছিল। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে, মৃদুল দে-কে অনিলবাবু গুরুত্ব দিয়ে নদীয়া জেলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মৃদুলবাবু নদীয়া পার্টিতে দলাদলি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটানোর পরিবর্তে সেটা বাড়িয়েছেন। তাই বিমানবাবু দায়িত্ব নিয়ে মৃদুল দে-কে পার্টির কেন্দ্রীয় ইংরাজি মুখপত্রের দায়িত্বে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া মৃদুলবাবু এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন বসিয়েছিলেন। বিমানবাবু বিভিন্ন জেনারেল বডির সভায় বর্তমান বিপর্যয়ের জন্য পার্টিকর্মীদের উপর দোষারোপ করেছেন। বিমানবাবু আরও বলেছেন যে জনসাধারণের কাছে না গিয়ে, ছোট ছোট গ্রুপ সভা না করে মনগড়া রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি বিজয়ী হওয়ার কথা বলেছিলেন অর্থাৎ তাঁর কোনও দোষ নেই। বিমানবাবুর কথায় শ্রমিক-কৃষক- ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন কেন করা হয়নি সে সম্পর্কে একটি কথাও তিনি বলেননি। বিমানবাবু কোনও সভায় নিজের আত্মসমালোচনা করেননি।

এ পর্যন্ত বিমানবাবুর বক্তব্যে যা রয়েছে সে-সবই এই পত্রিকার লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিমানবাবু বলেছেন, পার্টির জেলা-কমিটি সদস্য এবং নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে অহংবোধ যায়নি। তাঁরা এখনও মনে করে না যে তাঁরা ক্ষমতায় নেই।

বিমান বসুর এই আক্রমণাত্মক বক্তৃতার বিরুদ্ধে রাজ্যকমিটির সভার সকলেই সমালোচনা করেছেন। সমালোচনার মূল কথা হলো— বিমানবাবু কেন আগে থেকেই জেলা-কমিটির রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করেননি। এই সভায় নিন্দিত লক্ষ্মণ শেঠও রাজ্যনেতৃত্বকে ধুয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ''সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-এর ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার দোহাই দিয়ে রাজ্য-নেতৃত্ব নিজের দোষ স্খালনের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।'' নন্দীগ্রামের ব্যাপারে তিনি প্রতিটি স্তরেই রাজ্যনেতৃত্ব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রীকে জানিয়ে কাজ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, নন্দীগ্রাম ইস্যুতে যখন সমালোচনা প্রকাশ্যে এসেছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ''নন্দীগ্রাম সংক্রান্ত হলদিয়া অথরিটির নোটিশ ছিঁড়ে ফেলুন।''

রাজ্যকমিটির সভায় অনিল বসুও সমালোচনা করতে পিছপাও হননি। বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-এর পক্ষে একজনও বক্তব্য বলেননি। সিপিএম পার্টিতে সকলস্তরের নেতৃত্ব এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।

এবার অপর শিবির অর্থাৎ তৃণমূল শিবিরের কথা বলি। গত ৩১ জুলাই ২০১১ মহারাষ্ট্র নিবাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন,—''পার্টি থেকে ধান্ধাবাজদের বের করে দিতে হবে। হচ্ছেটা কি?'' সমবায়মন্ত্রী হায়দার আজিজ সাফিকে এক ঘর লোকের সামনে মমতা প্রশ্ন করেন, ''আপনি কি জানেন আপনার দফতরে কি কাজ হচ্ছে?''

প্রাণী সম্পদমন্ত্রী নূরে আলম চৌধুরী যিনি সিপিএমের প্রাক্তন লোক, তার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করে বলেন, ''আপনি দুধের দাম বাড়িয়েছেন, আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করেছিলেন?'' মমতা ব্যানার্জি সকল মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কাজের সমস্ত রিপোর্ট পরিকল্পনা মন্ত্রী মণীশ গুপ্তকে জানাতে হবে। মণীশ গুপ্ত বস্তুত মন্ত্রিসভার প্রধান। বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব মণীশ গুপ্তকেই দেওয়া হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ''দলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল এবং পার্টির নামে চাঁদা তোলা যাবে না। যত্রতত্র পার্টি-অফিস খোলা চলবে না। শান্তি বিঘ্নিত করা চলবে না।''—এই বক্তব্যই দলের চিত্র প্রকট করে।

মুকুল রায়কে তৃণমূল পার্টি কমিটির চেয়ারম্যান করে রেলমন্ত্রী না হওয়ার দুঃখ কি ভোলানো হলো? তৃণমূলের ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব, মমতাদেবী একাই বদলে দিলেন। উল্লেখ করা দরকার যুব তৃণমূলের সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। সেই সংগঠনে সৌরভ চক্রবর্তীকে কার্যনির্বাহ সভাপতি করে কি শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষমতা খর্ব করা হলো? আপাতত কেন্দ্রের সঙ্গে তথা প্রণব মুখার্জির সঙ্গে দ্বন্দ্ব হচ্ছে! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছেন, তাঁদের মঞ্জুরী ছাড়া কোনও রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। দার্জিলিঙে সমস্ত সাইনবোর্ডে দার্জিলিং মুছে দিয়ে গোর্খাল্যান্ড লেখা হয়েছে। ভবিষ্যৎ কি?

আমরা নেপালী কিন্তু প্রথমে হিন্দু

নেপালে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় শিবসেনা নামে সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, বিক্রম বাহাদুর বাম এই দলের সভাপতি এবং সূর্যপ্রসাদ প্রসাই শীর্ষ নেতা। শ্রী বাম বলেছেন, পার্টি নেপালে জনজাগরণ ও দেশভক্তি প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করবে। আমরা প্রথমে নেপালী এবং তারও আগে আমরা হিন্দু।

ভারতের (এক) চেটিয়া প্রাপ্তি

যদিও আঁচালে এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা কঠিন, তবুও উলফা নেতা অনুপ চেটিয়া-কে ভারতের হাতে পাবার একটা উজ্জ্বল আলোকরেখা আপাতত দৃশ্যমান হচ্ছে। গত ৩ আগস্ট বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন জানান খুব শীঘ্রই ভারতের হাতে অনুপ চেটিয়াকে তুলে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে চেটিয়াকে অনেকদিনই নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে ভারত। কিন্তু খালেদা জিয়ার আমল থেকেই বাংলাদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অনুপ চেটিয়াকে পরবর্তী সময়ে কখনওই ভারতের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি বাংলাদেশ। যদিও তাদের এহেন সুমতির অকস্মাৎ উদ্ভবের কারণ এখনও অজ্ঞাত!

ইতালীয় নিঃশব্দ সন্ত্রাস

সংবাদ মাধ্যমের কাছে খবর, রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাস থেকে হ্যাকিং-এর মাধ্যমে চুরি হয়ে যায় দেশের নিরাপত্তাজনিত খুবই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যাদি। মিডিয়া রিপোর্টে সন্দেহের তীর একটি ইতালীয় গোয়েন্দা সংস্থার দিকে। রাশিয়ার নিরাপত্তা ফার্মের সঙ্গে দূতাবাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও হ্যাক করে দ্য ন্যাশানাল অ্যান্টি ক্রাইম কম্পিউটার সেন্টার ফর ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোটেকশান। কু-লোকে বলছে, এক ইতালীয়র বদ-বুদ্ধিতে বারোটা বাজছে দেশের, অন্যদিকে সেই ইতালীয়-র মদতেই কুত্রোচ্চির মতো ইতালীয়বাসীরা এখনও বহাল তবিয়তে, আবার তার দেশের লোক-ই এখন ভারতের নিরাপত্তাকে লাটে তুলতে সক্রিয়!

গগৈ-এর ভ্রমণ খরচ

২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১, এই ৮টি আর্থিক বর্ষে স্রেফ চপার ভাড়ার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ খরচ করেছেন প্রায় ৯ কোটি টাকা (সঠিক হিসেবে ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ)। চপার মানে বিমানের মিনি এডিশন। আন্তঃরাজ্য ভ্রমণ করানোর ছাড়পত্রটুকুই যার রয়েছে। অর্থাৎ স্রেফ অসমেরই বিভিন্ন-প্রান্তে ভ্রমণ করতে গগৈ মশাই ৯ কোটি টাকা খসিয়ে ছেড়েছেন। ২০০২ থেকে বছর বছর এই খরচ বেড়েছে। গত দু'বছর সেই খরচের পরিমাণ প্রতিবারেই প্রায় ২ কোটির অঙ্ক ছুঁয়েছে। সাবাস, গগৈজী; কোষাগার ফাঁকা করে অসম বেড়াচ্ছেন, উন্নয়নের টাকাটা যোগাবে কে? কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া সেই টাকা যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের খাঁই মেটাতেই চলে যায়! এবার না হয় চীনের জুজু দেখান। বেশ ভালোই মানাবে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্যর্থ

বারবার সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ এবং তা প্রতিরোধে কেন্দ্র সরকারের 'জিরো টলারেন্স' মন্ত্র আওড়ানোর পর কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি, তার দিকে রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা অরুণ জেটলি যেমন আঙুল তুলেছেন, দেশের খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম খানিকটা হলেও তা মেনে নিয়েছেন। শ্রীজেটলির অভিযোগ হলো— সন্ত্রাসবাদ রুখতে সবরকমের সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। সরকার ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবে বিদেশমন্ত্রক অসহায় বোধ করছে। যারা সমাজের বিভিন্ন কাজে ব্রতী তাদের প্রতি কঠোর নীতিগ্রহণ করেছে। সরকার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরমনীতি গ্রহণ করছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক মুম্বাই বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগ যে ব্যর্থ তা চিদাম্বরম স্বীকার করে নিয়েছেন।

সোনার ভারত প্রথম

বিশ্বের মধ্যে ভারতের মানুষই সব থেকে বেশি সোনা ব্যবহার করে। সম্প্রতি লোকসভায় বালকৃষ্ণ শুক্লার এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেছেন, বিশ্ব সোনা পরিষদের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতই বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বেশী সোনা ব্যবহারকারী দেশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। রুপো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কানাডা, মেক্সিকো, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী, ইতালী ও জাপান এগিয়ে থাকলেও ভারতই সবার আগে রয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য মোতাবেক ২০০৭-০৯ আর্থিক বর্ষে সোনা আমদানী বাবদ ৮৪৭.৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

ইসলামের পথে ভারত-পশ্চিমবঙ্গ : সাচারের পরামর্শ

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

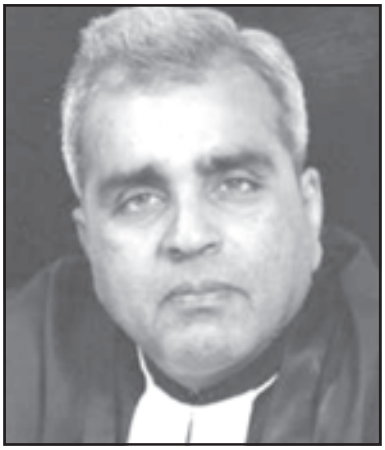

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। বাংলাভাগের পর ১৯৫১ সালে প্রথম লোকগণনায় রাজ্যে মুসলমানের অনুপাত ছিল শতকরা প্রায় ২০ জন এবং হিন্দুর অনুপাত ছিল ৮০ জন। বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৮ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা কমে হয়েছে শতকরা ৭২ জন।.... ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৫/৬, ২০১১-তে তা প্রায় ১২ গুণ বেড়ে হয়েছে ৬০ জন অর্থাৎ প্রায় ৫০টির বেশী আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী গদিতে বসেই ''বিস্‌মিল্লাহির রহমান রহিম' বলে যে মুসলিম ভোটাররা তাকে গদিতে বসতে মদত জুগিয়েছে তাদের দিল খুস্ করার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু ও হিন্দুস্থানের বাকি সর্বনাশের পথ প্রদর্শন যিনি করেছেন সেই বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সর্বনাশ ও মুসলমানদের পৌষমাসের ব্যবস্থা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সাচার সাহেব এরাজ্যে এসে ঘুরেও গেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের শ্বশুর জয়চাঁদ জামাইকে টাইট দিতে যেমন মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম দুশ্চরিত্র মহম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতের পবিত্র মাটিতে গো-হত্যা, মন্দির ধ্বংস, নারীহরণ ও বিষয়সম্পত্তি লুণ্ঠনের পথ খুলে দিয়েছিলেন, সেই দুরাত্মার কথা।

সাচারকে পশ্চিমবঙ্গে ডাকা হয়েছে কি কারণে? না, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কিভাবে তুলে ধরা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। মুসলমানরা পেছনের দিকে না হেঁটে যাতে সামনের দিকে হাঁটে সে পথ বাত্‌লাবেন সাচার সাহেব। কারণ চারদিকে রব উঠেছে মুসলমানরা না কি পশ্চাদপদ অর্থাৎ পেছনের দিকে তাদের পদযাত্রা অব্যাহত। তাদের এই পশ্চাৎগামিতা দূরীকরণার্থে প্রথমে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন এবং তারপর রাজেন্দ্র সাচার কমিশন গড়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কমিশনই মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার মূল কারণ অনুসন্ধান ও নির্দেশ করেনি। বিভাগ পূর্ব ও বিভাগোত্তর ভারতের ইতিহাসের পাতাও তাঁরা উল্টে দেখেননি মনে হয়। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে স্বয়ং তাঁদের নিয়োগকর্তাই অর্থাৎ ভারত সরকার তাঁদের পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

রঙ্গনাথের সুপারিশ নিয়ে রঙ্গ করার এবং সাচারকে মাথায় তুলে নাচার পথ খুলে দিয়েছে ভারত সরকার। তার সঙ্গে পোঁ ধরেছে লালু-মুলায়েম- মায়াবতী-মমতা-সমেত কিছু বামপন্থী দল ও নেতা। এঁদের কথাবার্তা ও আচার আচরণের ধারা দেখে মনে হয় যেন জয়চাঁদের প্রেতাত্মা তাঁদের উপর ভর করেছে। 'নামে হিন্দু কামে মুসলমান' এসব নেতা ও তাঁদের দল মুসলমানদের কোলে তুলবে, না মাথায় তুলবে সে ভাবনায় দিশাহারা হয়ে পড়েছে। মুসলমানরাও সুযোগ বুঝে যখন যার কোলে উঠে দুধ খাবার সুবিধা তার কোলে উঠছে এবং যখন দেখে বুকে আর রস নেই তখন অন্য কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। আর সারা দেশ জুড়ে রব উঠছে—মুসলমানরা বঞ্চিত, মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছে, এবং তার জন্য হিন্দুরাই দায়ী। ভয় হয় কবে শোনা যাবে মুসলমানদের ঘরে ঘরে ব্যাঙের ছানার মতো মুসলিম ছানাপোনা যে কিলবিল করছে তার জন্যও হিন্দুরা দায়ী। মুসলমান পাড়াতে ঢুকলেই দেখা যায় গণ্ডায় গণ্ডায় ''হাঁটিয়া যায় দুই পায় লোক তিনজন।" মুসলমান সমাজে 'খোদার কলে' যে দিনরাত নতুন নতুন মুখ উৎপাদন হচ্ছে, তাদের জন্মদাতা যদি অন্ন জোগাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হয়, তার দায়ভার কি হিন্দুদের বহন করতে হবে?

তাহলে শেষ থেকেই শুরু করা যাক।

ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার কোরান থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে মুসলমানদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। এভাবে মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিয়ে বৃটিশের সুয়োরানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। আর হিন্দুদের দুয়োরানী করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনা ও ক্ষতিসাধনের পথ পরিষ্কার করেছিল। পরিণতিতে মুসলমানদের মনে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ধিকিধিকি আগুনে বাতাস দিয়ে ভারত ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির ভূমিকা তৈরি করেছিল।

এই মুসলমানদেরই পূর্বপুরুষগণ ভারতে এসে হিন্দু-পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, নারীজাতির উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, হাজার হাজার নারীকে অপহরণ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশে নিয়ে গেছে। শিশুদের আছড়ে মেরেছে, মঠ-মন্দির ধ্বংস করেছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করেছে, ধনসম্পদ লুঠ করে ভোগ করেছে বা বিদেশে পাচার

করেছে। সাতশ' বছরের এই নির্যাতন অপমান ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে। প্রায় দু'শ বছর বাঙালী হিন্দু বৃটিশের দয়ায় শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছিল।

কিন্তু বৃটিশের বিদায়লগ্ন আসন্ন হতেই মুসলমানদের রক্তে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ অপহরণ দাহন ও বিনাশের স্তিমিত বীজ কিলবিলিয়ে ওঠে এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের ওপর নির্বিচারে প্রয়োগ শুরু হয়। তার ফলে দুই কোটি হিন্দুকে আধুনিক যুগের মুসলমানরা ভিটেমাটি ছাড়া করে তাদের বিপুল সম্পত্তি গায়েব করে। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হয়েও মুসলমানরা ভারতের এক তৃতীয়াংশ জমি নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলেও মুসলমান নেতারা সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে ভারত রেখে পাকিস্তানে পাড়ি দেয়। এই সাড়ে তিন কোটি মুসলমান খোদার বরকতে ৬৪ বছরে ৫ গুণ বৃদ্ধি হয়ে ১৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। একদিকে বাংলাদেশ থেকে অবিরাম অনুপ্রবেশ ও কুকুর বিড়াল ছাগল শুয়ারের মতো বাচ্চা পয়দা করে মাথাগুনতি রাজনীতিতে একের পর এক বিধানসভা ও লোকসভা আসন থেকে হিন্দুদের হটিয়ে মুসলমানরা দখল করে নিচ্ছে এবং একাধিক রাজ্যে শাসনক্ষমতা দখল করে কেন্দ্রেও সরকার গঠনের চাবিকাঠি করায়ত্ত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। বাংলাভাগের পর ১৯৫১ সালে প্রথম লোকগণনায় রাজ্যে মুসলমানের অনুপাত ছিল শতকরা প্রায় ২০ জন এবং হিন্দুর অনুপাত ছিল ৮০ জন। বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৮ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা কমে হয়েছে শতকরা ৭২ জন। গত বিধানসভার নির্বাচনে হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার এই বাড়তি-কমতির চিত্র ভালোভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৫/৬, ২০১১-তে তা প্রায় ১২ গুণ বেড়ে হয়েছে ৬০ জন অর্থাৎ প্রায় ৫০টির বেশী আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

সুতরাং মুসলমানরা পিছিয়ে আছে একথা ডাহা মিথ্যা। তারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আছে। তারা আরও এগিয়ে আছে :

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষায়— ১৯৭৭ সালে মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৮৮; ২০১০ সালে তা হয়েছে ৪,৫০,০০; অর্থাৎ ১০০ গুণ বৃদ্ধি।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ৬১০ কোটি টাকা। মক্কা ও আরবের টাকায় হাজার হাজারে মসজিদ তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। সেসব সঙ্গে সঙ্গে সরকারি অনুমোদন পাচ্ছে। তাদের শিক্ষক অর্থাৎ ইমামরা সরকারি কর্মচারীদের সমান মাইনে পায়— তাদের সংখ্যা সারা ভারতে তিন লক্ষে পৌঁছেছে।

(গ) কুখ্যাত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপিত হয়েছে মুর্শিদাবাদে—পশ্চিমবঙ্গে ১২/১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় কেন?

'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া তুলে তারা দেশ ভাগ করেছে, এখন 'মুসলমানরা পিছিয়ে আছে' জিগির তুলে দেশকে টুকরা টুকরা করার বদ মতলবে মেতেছে। জননযন্ত্রকে যারা ভোটযন্ত্র দখলের কৌশলরূপে ব্যবহার করছে, তাদের পক্ষ থেকে কাঁদুনি গাইতে আসা সাচারকে 'দূর হটো' বলে স্বাগত জানাতে জানানো দরকার।

তদুপরি সুন্দরবনের মুসলমানদের জন্য আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জবান দিয়েছেন দিদিজী।

(ঘ) মাদ্রাসাগুলিতে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই শেখানো হয় না—যা পড়ানো হয় তা হলো—আরবী, ইসলামের ইতিহাস, কোরান, হাদিস, আকায়িদ, ফিকাহ্ ফারায়েজ ও মুসলমান মনীষীদের জীবনী। এসব বস্তাপচা জিনিস পড়ে ও পরীক্ষা পাশ করে মুসলমান ছাত্র- যুবকগণ এক একটি 'মিনি' ওসামা-বিন-লাদেন হয়ে বেরিয়ে আসে। ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং হিন্দুস্থানকে খতম করার শিক্ষা দেয়।

(ঙ) ভারত সরকার মুসলমানদের হজের টাকা জোগাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের জন্য শহরে শহরে হজ-হাউস তৈরি করেছে। খরচটা অবশ্যই হিন্দু করদাতাদের পকেট কেটে।

(চ) ইতিমধ্যেই মুসলমানদের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে অনুদান ও ঋণদানের ব্যবস্থা হয়েছে। সংখ্যালঘু নামে মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ চাকুরি সংরক্ষণ করে এবং ৮টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ও বি সি তালিকাভুক্ত করে রাজ্যের ২ কোটি ২ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষকেই সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। আর কি চাই?

(ছ) মুসলিম শিক্ষা ও তমুদ্দিনের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে :

(১) সংখ্যালঘু কমিশন
(২) উর্দু একাডেমি
(৩) হজ কমিটি
(৪) মাদ্রাসা বোর্ড
(৫) মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন
(৬) ওয়াকফ বোর্ড ইত্যাদি। তারপরেও মুসলমানদের জন্য কিছু করা হয়নি বলা নিমকহারামি।

(জ) স্কুল লেভেলে সংস্কৃত শিক্ষা তুলে দিয়ে এবং সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র টোলগুলিকে ভাতে মেরে হিন্দুছাত্রদের ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্য-ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মূলোচ্ছেদ ঘটান হয়েছে। অপরপক্ষে জাতীয়তাবিরোধী ও হিন্দুত্ববিরোধী শক্তিগুলিকে মদতদানে লিপ্ত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতির খোরাক জোগাচ্ছে হিন্দুদের প্রদত্ত ট্যাক্স থেকে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে। ইতিমধ্যে উর্দুকে আঞ্চলিক ভাষারূপে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

যুক্ত নির্বাচনের পাপের বোঝা ও দলবদ্ধ মুসলিম ভোটের কাঙাল হিন্দু নেতাদের আত্মঘাতী নীতিই হিন্দুর রাজনৈতিক অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ভোট কেন্দ্রের সামনে মুসলিম নারীপুরুষের দীর্ঘ লাইন দেখলে সেটা ভোটের লাইন না নামাজের লাইন সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। ধর্মীয় সঙ্ঘবদ্ধতা রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। মুসলমানদের ছেঁড়া জুতা সাফসুরুৎ করার জন্য হিন্দু নেতাদের কাড়াকাড়ি নির্লজ্জতার সব সীমা অতিক্রম করেছে।

মুসলমান সমাজে পাকা বাড়ি ও দুই-তিন-চার-ছয়-আট চাকার গাড়ির হিসাব নিলেই বোঝা যাবে মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে আছে কিংবা পিছিয়ে আছে। 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া তুলে তারা দেশ ভাগ করেছে, এখন 'মুসলমানরা পিছিয়ে আছে' জিগির তুলে দেশকে টুকরা টুকরা করার বদ মতলবে মেতেছে। জননযন্ত্রকে যারা ভোটযন্ত্র দখলের কৌশলরূপে ব্যবহার করছে, তাদের পক্ষ থেকে কাঁদুনি গাইতে আসা সাচারকে 'দূর হটো' বলে স্বাগত জানাতে জানানো দরকার।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদই জাতীয় নিরাপত্তার এক নম্বর সমস্যা

অতিথি কলম

ডঃ সুব্রমানিয়ান স্বামী

২০১১ সালের ১৩ জুলাই মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে হিন্দুদের দৃঢ়সংকল্প আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সমগ্র জাতিকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত হালালের কায়দায় ক্রমাগত প্রতিদিন রক্ত ঝরানো হিন্দুরা আর সহ্য করবে না। সন্ত্রাসকে আমি এখানে এইভাবে ব্যাখ্যা করব যে, একটা শক্তির বেআইনী ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক জনসমাজকে অত্যধিক আতঙ্কগ্রস্ত করে তাকেই তৈরী করা হয়েছে অথবা হয়নি নিজের ইচ্ছা ও মঙ্গল-এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে।

১৩/০৭-এ মুম্বাই–আক্রমণে আহতের চিকিৎসা চলছে (ফাইল চিত্র)।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার এক নম্বর সমস্যাটি হলো ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ। এনিয়ে ২০১২-র পর আর কোনও সংশয় থাকবে না। আমার মনে হয়, ওই বছরে পাকিস্তানের দখল নেবে তালিবানরা এবং আমেরিকানরা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাবে। তখন ইসলাম হিন্দুত্বকে 'চিরতরে শেষ করে দিতে' সম্মুখ সমরে নামবে। ইতিমধ্যেই আল কায়দা'র মতো ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরীরা ঘোষণা করেছে, ভারত-ই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর মূল লক্ষ্য, আমেরিকা নয়।

কট্টর মুসলিমের বিবেচনায় হিন্দুপ্রধান ভারত হলো 'ইসলামিক রাজত্বের একটি অসমাপ্ত অধ্যায়'। ইসলামী রাজত্বের অন্যান্য সব দেশে ইসলামী আক্রমণের দু'যুগের মধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের ১০০ শতাংশ-ই ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৪৭-এ অবিভক্ত ভারতবর্ষে, এমনকী ৮০০ বছর নিষ্ঠুর ইসলামিক শাসনের পরেও হিন্দু ছিল ৭৫ শতাংশ। কট্টরপন্থীদের কাছে ব্যাপারটা বেশ বেসুরো ঠেকবে।

এক অর্থে, আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করার জন্য মুসলিম কট্টরপন্থীদের দোষারোপ করছি না। আমি দোষ দিচ্ছি হিন্দুদের, সনাতন ধর্ম যাঁদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর অনুমতি দিয়েছেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই লক্ষ লক্ষ হিন্দু কুম্ভমেলার জন্য সমবেত হতে পারেন, সম্পূর্ণ স্ব-আয়োজিত ভাবে; কিন্তু কাশ্মীর, মউ, মেলভিশ্রম, মালাপ্পুরমের হিন্দুরা যে বিপন্ন, তা ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্তমনে তারা ঘরে যায়। এবং হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করতে সামান্য আঙুলটুকুও এরা বাড়িয়ে দেন না। যদি অর্ধেক হিন্দুর ভোটও একত্র করা যায়, জাত ও ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে, তবে একটি প্রকৃত হিন্দু রাজনৈতিক দল সংসদ এবং বিধানসভাগুলিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে।

ভারতের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিকতম ইসলামিক সন্ত্রাসের ইতিহাস ও ভারতের সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নিতে হবে যেহেতু এই সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হিন্দুরাই। তাদের পক্ষে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে যে ভারতের মুসলমানদের ধীরে চলো প্রক্রিয়ায় মৌলবাদী হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের আত্মঘাতী মানসিকতাকে কাজে লাগানো হবে। যেভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা সংগঠিত হচ্ছে তার উদ্দেশ্যই হিন্দু-আত্মাকে কবর দেওয়া এবং গৃহযুদ্ধের একটা ভীতি সৃষ্টি করা।

হিন্দুদের অবশ্যই সামগ্রিকভাবে নিজেদের 'হিন্দু' হিসেবে প্রতিপন্ন করা উচিৎ এবং কখনও নিজেদের অন্যদের থেকে 'আলাদা' করে দেখা উচিত নয়, কিংবা আরও বাজে ব্যাপার হলো, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি গোছের আত্মপ্রসাদে ভোগা। যদি কোনও হিন্দু প্রকৃতপক্ষেই যন্ত্রণা ভোগ করেন, যেহেতু তিনি হিন্দু ছিলেন, সেই কারণে প্রতিটি হিন্দুও সমব্যথী হবেন। এটাই হলো প্রয়োজনীয় মানসিক দৃষ্টিকোণ, যা আদর্শনিষ্ঠ সুবিশাল হিন্দু সমাজের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুঝতে আমাদের হিন্দু হিসেবে প্রয়োজন সমষ্টিগত মানসিকতা গড়ে তোলা। ভারতের মুসলমানরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন যদি তাঁরা সত্যিই হিন্দুদের আপন বলে অনুভব করেন। তাঁরা এটা ভাবতে পারেন বলে আমি তখনই বিশ্বাস করব যদি গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেন যে তাঁরা মুসলমান হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দু। যদি কোনও মুসলমান এই হিন্দু পরম্পরার ব্যাপারটা তাঁর ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেন, সেক্ষেত্রে আমরা হিন্দুরা তাঁকে বৃহৎ হিন্দু সমাজ, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অংশ বলে গ্রহণ করে নেব। ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত অর্থাৎ হিন্দুস্থান হলো হিন্দু জাতি (নেশান)-র এবং সেই সমস্ত মানুষের যাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন। যাঁরা এই ব্যাপারগুলো মানতে অস্বীকার করবেন অথবা সেইসব বিদেশীরা যাঁরা নথিভুক্তিকরণের (রেজিস্ট্রেশন) মাধ্যমে ভারতের

নাগরিক হয়েছেন, অবশ্যই তাঁরা ভারতে থাকতে পারেন কিন্তু তাঁদের ভোটের অধিকার থাকা উচিৎ নয় (যার অর্থ তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হতে পারবেন না)।

প্রতিটি হিন্দুকে বিরাট হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত করে তবেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনও নীতির সূচনা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য দরকার হিন্দু-মানসিকতা যেটা ব্যক্তিগত চরিত্র এবং রাষ্ট্রীয় চরিত্রের পরিচায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মনমোহন সিং-এর কথা, যাঁর উচ্চ-ব্যক্তি চরিত্র রয়েছে কিন্তু অর্ধশিক্ষিত সোনিয়া গান্ধীর রাবার স্ট্যাম্প হয়ে এবং প্রতিটি জাতীয় ইস্যুতে নাস্তানাবুদ হয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁর কোনও রাষ্ট্রীয় চরিত্র নেই।

সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় যে দ্বিতীয় শিক্ষাটা প্রয়োজন তা হলো, আমরা কারুর কোনও 'দাবী'র কাছে আত্মসমর্পণ করব না বা পিছু হটব না। যেটা আমরা করেছিলাম ১৯৮৯-এ (মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়ার বিনিময়ে ৫ জন সন্ত্রাসবাদীকে মুক্ত করে দিয়ে) কিংবা ১৯৯৯-এ, ভারতীয় এয়ারলাইন্সের (ফ্লাইট নং, আই সি-৮১৪) অপহরণের পর তিন সন্ত্রাসবাদীকে মুক্ত করে।

এ নিয়ে যে তৃতীয় শিক্ষাটা প্রয়োজন তা হলো, যেখানে যত ছোট-ই সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটুক না কেন, সমগ্র জাতিকে তার সমুচিত জবাব দিতে হবে ব্যাপকভাবে। যেমন, যখন অযোধ্যা মন্দির আক্রান্ত হবে বলে রব তোলা হলো, আমাদের উচিত ছিল ওই চত্বরে রাম-মন্দির পুনরায় গড়ে তার সমুচিত জবাব দেওয়া।

মুসলিমদের জন্য হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়া উদারপন্থীদের মতে, সন্ত্রাসবাদীরা জন্মায় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, পীড়ন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে। তাদের যুক্তি, এদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে, সমাজকেই ওই চারটি অক্ষমতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সমস্যার শেকড়কে উপড়ে ফেলতে হবে। এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। ওসামা বিন লাদেন একজন কোটিপতি। ব্যর্থ হওয়া টাইমস স্কোয়ার কাণ্ডে, ব্যর্থ হওয়া সন্ত্রাসবাদী শাহজাদ পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবারের ছেলে ও নামী মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি এ পাশ করা এক ছাত্র।

এটা একটা হাস্যকর ধারণা যে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নিবৃত্ত করা যায় না কারণ তারা বোধ-বুদ্ধিহীন এবং মরবার জন্য সদা-প্রস্তুত। সন্ত্রাসবাদীদের মূল মস্তিষ্কের একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে এবং তাদের ধ্বংসাত্মক পাগলামোর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিও রয়েছে। সন্ত্রাসবাদকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে হলে সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল হলো ওই রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে দমিয়ে দাও এবং সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে তাদেরকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল। ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ ভেস্তে দিতে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি।

সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ১ : ভারতকে ভয় দেখিয়ে কাশ্মীরকে বাগে আনা।

আমাদের কৌশল : সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবসান এবং উপত্যকায় প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন। হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়ের জন্য পানুন কাশ্মীর তৈরি করা। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দখলের জন্য সুযোগ তৈরি করা অথবা সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। যদি পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া অব্যাহত রাখে তাহলে আমরাও বালুচ ও সিন্ধিদের তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করব।

সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ২ : মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটাও, হিন্দু ভক্তদের মারো।

আমাদের কৌশল : কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে মসজিদ হটিয়ে দাও এবং অন্যান্য মন্দির চত্বর থেকেও প্রায় ৩০০ মসজিদ অপসারণ কর।

সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ৩ : ভারতকে দারুল ইসলামে পরিণত করা।

আমাদের কৌশল : অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কার্যকর করা, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন এবং বন্দেমাতরম গাওয়া আবশ্যিক করতে হবে এবং ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে যেখানে অহিন্দুরা তখন-ই ভোটাধিকার পাবে যখন তারা গর্বভরে স্বীকার করে নেবে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল হিন্দু। ভারতের নামকরণ পুনরায় হিন্দুস্থান করতে হবে, হিন্দু জাতি এবং যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন তাদের দেশ বলে।

সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ৪: ভারতের জনসংখ্যার ভারসাম্য বদল করে দাও, বেআইনী অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ এবং পরিবার-পরিকল্পনা অস্বীকারের মাধ্যমে।

আমাদের কৌশল : জাতীয় আইন প্রচলন করে হিন্দু থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা রুখতে হবে। পুনঃধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করলে চলবে না। ঘোষণা করা দরকার যে জাত (কাস্ট) নির্ণয় যদিও জন্মের ওপর ভিত্তি করে হবে না কিন্তু 'কোড' বা 'ডিসিপ্লিন'-এর ওপর নির্ভর করে তা হবে। অহিন্দুদের স্বাগত জানিয়ে পুনরায় তাদের ধর্মান্তরকরণ করতে হবে, তাদের পছন্দমতো 'কোড অফ ডিসিপ্লিন' অনুযায়ী জাত বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে রয়েছে তার সমানুপাতিক সংযুক্ত জমি বাংলাদেশ থেকে নিতে হবে। বর্তমানে সেদেশের উত্তরাংশে (নর্দার্ন থার্ডে) সিলেট থেকে খুলনা পর্যন্ত জায়গা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতেই পারে অবৈধ অভিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য।

সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ৫ : উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও গীর্জায় প্রবচনের মাধ্যমে হিন্দুত্বকে কলুষিত করার চেষ্টা, যাতে করে হিন্দুরা নিজেদের আত্মসম্মানজ্ঞান হারায় এবং তাদের নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত করা যায়।

আমাদের কৌশল : হিন্দু মানসিকতার উন্নতিকল্পে নিরন্তর প্রচার চালানো।

এই জাতীয় কৌশল অবলম্বন করলে ভারত আগামী ৫ বছরের মধ্যে তার সন্ত্রাসবাদী সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু এজন্য উপরোক্ত চারটি পাঠের যে কার্যপদ্ধতির (আউটলাইন) উল্লেখ করা হলো তার শিক্ষাটা এই মুহূর্তে খুবই দরকার। এবং হিন্দু মানসিকতাকে ঠিক সেইভাবেই গড়ে তুলতে হবে যাতে তাঁরা জাতি (নেশন)-কে নির্ভরতা দিতে সাহসী, ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদি ইহুদিরা ভেড়ার মতো চুপচাপ গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করা থেকে মাত্র দশ বছরে হিংস্র সিংহে পরিণত হতে পারেন তবে তার থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় থাকা হিন্দুদের (হাজার হোক ভারতে আমরা ৮৩ শতাংশ) পক্ষে ৫ বছরে এই কাজটা করা খুব একটা কঠিন নয়।

গুরু গোবিন্দ সিং দেখিয়েছেন যে পাঁচজন ভয়-ডরহীন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বে কিভাবে একটা গোটা সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। এমনকী যদি অর্ধেক হিন্দু ভোটারও সামগ্রিকভাবে হিন্দু হিসেবে ভোট দেন এবং হিন্দু-অ্যাজেন্ডা-কে ঠিকমতো পালন করার জন্য একটি আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল থাকে, তবেই আমরা বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের স্বপক্ষে উপযুক্ত হাতিয়ার পাব। এই মুহূর্তে সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে গণতান্ত্রিক হিন্দুস্থান থেকে সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে নির্মূল করতে কৌশলের শেষ কথা হওয়া উচিত এটাই।

(লেখক : জনতা পার্টির সভাপতি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক)

অখণ্ড ভারতের সাধনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের ভারতবর্ষ এক অখণ্ড সাধনভূমি। এই অখণ্ডিত দেশেই হাজার হাজার বছরের বহু সভ্যতার সাধনাই পাশাপাশি বিরাজমান। এই দেশ সিন্ধু নদের দ্বারা পরিচিত হিন্দুস্থান। এখানকার সকল সংস্কৃতির সম্মেলনে সমৃদ্ধ হিন্দুধর্ম। এই দেশের সব সাধনার দান রয়েছে সেই ধর্মে। এই অখণ্ড দেশের সর্বত্রই বৈদিকসন্ধ্যা গায়ত্রী, শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ও শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র পূজিত। রামায়ণ মহাভারত সর্বত্র সমাদৃত। তন্ত্রমতে তো ভারতবর্ষের ৫১ পীঠ একই দেবী জগন্মাতার ৫১টি অঙ্গ। তাতে হিমালয়ের জ্বালামুখী হতে দক্ষিণের কুমারিকাতীর্থ, পশ্চিমের হিংলাজ হতে অসমের কামরূপ সবই দেবীর আপন জীবন্ত অঙ্গ। দেবীর এই জীবন্ত দেহকে আমরা যেন খণ্ডিত না করি এটাই শক্তি আরাধনার মর্মগত কথা।

আমাদের কাম্য দেবতাকে ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে চারধামে ৮৪টি তীর্থে দর্শন ও অর্চনা করলেই পূর্ণাভিষেক হয়। গঙ্গা গীতা গোমাতা সমগ্র ভারতবর্ষের জীবন্ত বিগ্রহ। কাশীতে সমগ্র ভারতবর্ষকেই দেখা যায়। কাশীর ঘাটে ঘাটে সর্বপ্রদেশের তীর্থযাত্রীদেরই স্থান। গয়া, পুষ্কর, বদ্রীনাথ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রগুলি সর্বপ্রদেশের মৃতব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধস্থান। সারাভারতের একই রকমের জাতিভেদ। সমাজব্যবস্থা, দশবিধ সংস্কার, একই রকমের মাস বৎসরাদি গণনা। দেশের সর্বত্রই নবরাত্রি, বাসন্তীপুজো, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি হয়। সারা ভারতে গৃহী-সংসারীর আচার সংস্কার সামান্য ইতরবিশেষ হলেও সর্বত্রই প্রায় এক রূপ। শঙ্করাচার্যের জন্ম মালাবারে হলেও তাঁর চারি মঠ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে। তাঁর সম্প্রদায় সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী প্রণবানন্দ বাংলার লোক হলেও তাঁর আশ্রম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সারা ভারতেই রয়েছে। শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের মতো রামানুজ নিম্বার্ক মাধব সম্প্রদায়ও সর্বভারতে পূজ্য। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের হুকুম ভারতের সর্বত্র চলে। 'শিবো হোং'—'আমি শিব, তুমিও শিব' এই উদার মত সমগ্র ভারতের।

এই অদ্বৈতবাদী ঈশ্বর দর্শন, সকলের মধ্যে শিবদর্শন— 'যত্র জীব তত্র শিব' অর্থাৎ কেবলমাত্র শিব পুজোই ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। হিন্দুর আটপৌরে জীবনচর্চাতে সারা ভারতে একই রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। ভোরবেলায় 'দুর্গা' নাম বা প্রিয় দেবতার নাম স্মরণ করে শয্যা ত্যাগ করা— নিষ্ঠাবান হলে মাটিতে পা দেবার আগে সর্বংসহা ধরিত্রীর বন্দনা, সদ্য উদিত সূর্যের প্রণাম, তারপর স্নান এবং প্রাতঃকালীন উপাসনা। স্নানের সময় সারা ভারতের সকল নদীকেই আবাহন করতে হয়। সারা ভারতই সেখানে এক :

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিং।।

গঙ্গা প্রভৃতি সকল নদী সর্বতীর্থ এখানে সমবেত হউক। স্নানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থানেত্যানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ।।

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ আমার স্নান কালে এখানে সমবেত হোক। অর্থাৎ গোটা ভারত একত্র না হলে আমাদের স্নান করাও চলে না। যাঁরা উপনয়নের পর সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন তাঁরা রোজ সকালে স্মরণ করছেন ভারতের সমস্ত নদীকে—

গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

'স্বাহা' মন্ত্রে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা আজও দেবতাকে দ্রব্য উৎসর্গ করছেন সারা ভারতের মানুষ। 'স্বধা' মন্ত্রে শ্রাদ্ধতর্পণ করে পিতৃপুরুষকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন গুজরাত থেকে অসম পর্যন্ত সকলে। শিবরাত্রিতে সকলেই স্মরণ করছেন সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, হিমালয়ে কেদারনাথ, দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর, মধ্যপ্রদেশে ওঙ্কারেশ্বর, ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ, রাঢ়ে তারকেশ্বর, কামরূপে উমানাথ, অন্ধ্রপ্রদেশে মল্লিকার্জুন—প্রভৃতি শিবের দেশব্যাপী রূপসমূহ।

পিতৃপক্ষে গয়া যাচ্ছেন সমগ্র দেশের মানুষ, কুম্ভমেলা ভারতের সমগ্র মানুষের মিলনমেলা। সারা ভারতে এসে মিলিত হয় গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তি স্নানে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লেগে যাচ্ছে এই মিলন মেলার সেবায়। লক্ষ শ্রোতা মণ্ডপে বসে রামদেবজী বাবার আহ্বানে যোগচর্চা করছেন, শুনছেন মুরারিবাপু, আশারামজীবাপু বা বিজয় ওঝার কণ্ঠে ভাগবত ব্যাখ্যান—টেলিভিশনে দেখছেন রামায়ণ মহাভারত। সিডিতে ঘরে ঘরে বাজছে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ। আমাদের মৃত্যুর পরেও সেই একই ভাবনা :

গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রং চ গঙ্গাং চ যমুনাচ্চ সরিদ্ধরাম্।।
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাং চ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্
ভদ্রাবকাশাং সরযূং গণ্ডকীং পনসং তথা
বৈণবং চ বরাহং চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।।

গয়া প্রভৃতি সবতীর্থ, ভারতের সব পর্বত, কুরুক্ষেত্র গঙ্গা যমুনা কৌশিকী চন্দ্রভাগা, সরযূ গণ্ডকী প্রভৃতি সব নদী, পনস বৈণব বরাহ পিণ্ডারক প্রভৃতি সব তীর্থকে আহ্বান করি। সকলে সন্নিহিত হয়ে এই বিগ্রহপ্রাণ দেহকে পবিত্র করুন। জনমে মরণে অখণ্ড ভারতকে আহ্বান না করলে এখনও আমাদের চলে না। *অখণ্ড ভারতের কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। তাই জন-গণ-মন অধিনায়ক গানে তিনি বলেছেন—*

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।

ভারত বিভাগ রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। তাঁরও স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত। কিন্তু বাংলা ভাগ তিনি দেখেছিলেন। বাংলা ভাগে তাঁর কি বেদনা হয়েছিল তা সকলেই জানেন। খণ্ডিত বাংলাকে মিলিত করার জন্য রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তিত করেন। শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতার স্থান নেই। বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা কান্যকুব্জ হতে এ রাজ্যে আসে। হাজার বছর পূর্বে বহু বাঙালী হিমালয়ের গাড়ওয়াল প্রদেশে গিয়ে বাস করে। কর্ণাটক রাজবংশের লোক বাঙলাদেশে সেনবংশ প্রবর্তন করেন। তাঁদেরই বংশের রাজারা পরে হিমালয়ে সুকেত মাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতের রাজা সাতবাহনের সময়ের কলাপ ব্যাকরণ চলে কাশ্মীরে এবং বঙ্গদেশে। বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজার গল্প সারা ভারতের উপজীব্য। একসময় অখণ্ড ভারতের যোগাযোগের ভাষা ছিল সংস্কৃত। ভারতবর্ষ হলো সকল ধর্মের সকল মানবজাতির মহামিলন ক্ষেত্র। এই দেশকে যিনি মাতৃভূমি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করেন তিনিই ভারতবাসী। তবে আমাদের ধর্মীয় পরিচয় আলাদা হলেও আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় হিন্দু। কারণ হিন্দু একটি জীবন ধারার নাম। হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের আত্মা। তবুও একথা আজও সত্য যে, হিন্দুর শত্রু হিন্দু। কারণ ভারতকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে ধূলিসাৎ করার জন্য যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তা হিন্দুইতো জোগাচ্ছে, হিন্দুকে বিকৃত ও বীভৎস আকারে চিত্রিত করবার জন্য যে কৌশল প্রয়োজন তাও হিন্দুই যোগান দিচ্ছে। এর কারণ কি? ১৯৪৩ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'কিংকর্তব্যম্' নামক এক প্রবন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই কারণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'প্রথম, একশ্রেণীর শিক্ষিতলোকের অজ্ঞতা; দ্বিতীয়, অপর একশ্রেণীর লোকের 'অর্থচিন্তা চমৎকারা' প্রভৃতি সঞ্জাত কারণবশত মস্তিকা ভাড়া দেবার প্রবৃত্তি, তৃতীয় একদল লোকের শ্রেণীস্বার্থ।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র হচ্ছে, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্যার সমন্বয়—একটি বিশিষ্ট বা বিশেষ শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ সংঘ নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্যার দূরীকরণ অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে।' ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন ধ্বংস করে না বরঞ্চ পূর্ণতা আনে। বেদান্ত মিলনের দর্শন বিচ্ছেদের নয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটেছিল এক মহান অনুপ্রেরণার আবহাওয়ার মধ্যে। এই অনুপ্রেরণা হতে জাত জীবনীশক্তি এখনও অমৃতরস প্রবাহে প্রবাহিত। বস্তুত হিন্দুত্ব হলো একগুচ্ছ মূল্যবোধ। যার মূল বৈশিষ্ট্য বিবিধতার মধ্যে একতা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। অথচ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনেতারা বলেছেন, ভারতে বহু ভাষা, জাতি, বর্ণ, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি থাকাতে ভারত এক রাষ্ট্র নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনেতাদের এই মন্তব্য যে সঠিক নয় তা মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে—

'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতের সংস্কৃতি অখণ্ড। বহু সংস্কৃতির যোগাযোগ আমাদের এই হিন্দু সংস্কৃতি। আমাদের মধ্যে কিছু আছে বেদাচার, তন্ত্রাচার, কুলাচার এবং স্ত্রী আচার। কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। সব মিলিয়েই ভারতের সম্মিলিত ধর্ম। হিন্দু অর্থে ভারতীয়। এখানে কোনও সংস্কৃতিই অন্য সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেনি। একই শিব ও বিষ্ণু এবং দেবী নানাভাবে সর্বত্র পূজিত হন। একই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও ভাগবত নানা প্রদেশে পঠিত হয়। একই গয়াতীর্থে সকলেই পিতৃকৃত্য করেন। ১৯২৩ সালে কাশীতে ভ্রমণকালে কাশীর ঘাটে ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে নানা প্রদেশের লোকের পাশাপাশি পূজা অর্চনা ও ব্রতাদি আচার দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই একস্থানে বসিয়াই সারা ভারতের পরিচয় মিলিতে পারে'। যে দেবতাদেরই অর্চনা করি না কেন চারধামের অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সারা ভারতের চার তীর্থের সলিলে ইষ্টদেবতার অভিষেক না হলে অভিষেক পূর্ণ হয় না। শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতের জন্য দশনামী সম্প্রদায় গড়েছেন। তান্ত্রিকেরা তো সমগ্র ভারতবর্ষকে একই জগন্মাতার পুণ্যদেহ বলে মনে করে ৫২ পীঠে তাঁর ৫২ অঙ্গ বলে মেনেছেন! পীঠস্থানের মধ্যে হিংলাজ হলো বেলুচিস্তানে আর কামরূপ হলো অসমে, কুমারিকা হতে জ্বালামুখী সর্বত্রই দেবীর অঙ্গ। দেবীর সেই অখণ্ড দেহ কি খণ্ডিত করা যায়? একই শিব একই বিষ্ণু অখণ্ড ভারতের সর্বত্র। রাম, লক্ষ্মণ, অর্জুন, সুভদ্রা, সীতা নামকরণ কেবল উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারতের মানুষের নাম নয়, এ নাম অখণ্ড ভারতের সর্বত্র। বালি, জাভা, সুমাত্রা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানে এ নাম ঘরে ঘরে সমাদৃত। রাজনীতিকরা দেশ ভাগ করতে পারেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভাগ করতে পেরেছেন কি? রাজনীতিকরা বাঙালি মারাঠীতে, মারাঠী আসামীতে বিবাদ অথাৎ জাতি জাতিতে বিবাদ ঘটাতে পারেন কিন্তু জাতীয়তাবাদ মুছে দিতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামনামের মাহাত্ম্যে সারা ভারত সেদিন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম ও আমাদের সংস্কৃতি খণ্ডিত ভারতকে আগামীদিনে অখণ্ড ভারতে রূপান্তরিত করতে পারবে।

ভারত বিভাগ রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। তাঁরও স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত। কিন্তু বাংলা ভাগ তিনি দেখেছিলেন। বাংলা ভাগে তাঁর কি বেদনা হয়েছিল তা সকলেই জানেন। খণ্ডিত বাংলাকে মিলিত করার জন্য রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তিত করেন।

অখণ্ড ভারতের ভাবনা ও কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

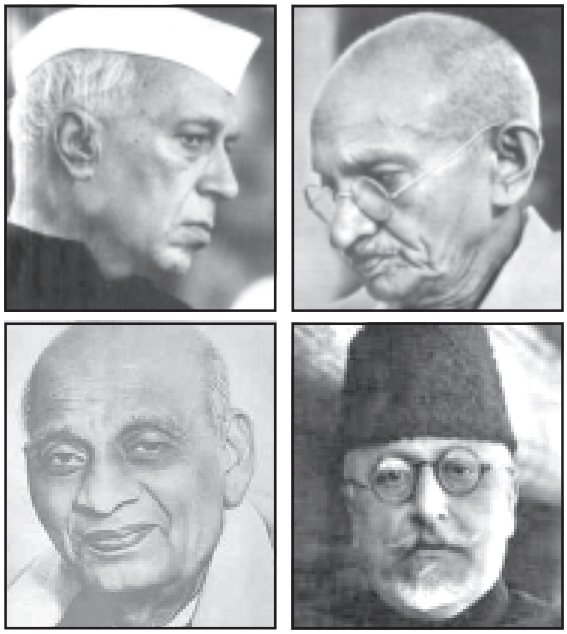

১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল। দেশবিভাগের ব্যাপারে ছিল তিনটে পক্ষ—বৃটিশ- সরকার, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ। তাদের স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও লালসাই সেদিনের কোটি কোটি মানুষের জীবনে এক মর্মন্তুদ অভিশাপ বয়ে এসেছিল।

মৌলানা আজাদও ছিলেন সেই সময় একজন প্রধান কংগ্রেস নেতা। কিন্তু তাৎপর্যের বিষয় হলো— তিনি নিয়েছিলেন প্রতিবাদী ভূমিকা। তিনি ছিলেন ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায়— দেশভাগের 'ঘোর বিরোধী' (আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃ: ৩১০)। তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

অবশ্য প্রথম দিকে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ প্রভাবশালী নেতারাও ছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা। কিন্তু বৃটিশ সরকার বহু আগে থেকেই যে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল্' নীতি গ্রহণ করেছিল, সেই ধারা অনুসরণ করেই তারা ক্রমে মুসলীম লীগের নেতা জিন্নাকে পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে উস্কে গেছে। ফলে লীগ ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তান-দাবি' গ্রহণ করেছে এবং তার জন্য অনমনীয় লড়াই চালিয়ে গেছে। সরকারের তরফ থেকে জিন্নাকে বলা হয়েছে অনড় থাকার জন্য। তার ফলে ক্রীপস্-মিশন, ক্যাবিনেট মিশন, সিমলা-বৈঠক, অন্তর্বর্তী সরকার— সবই ব্যর্থ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) তারিখে ঘোষণা করেছেন— ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ-সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং সেই ব্যবস্থা সাঙ্গ করার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে এদেশে পাঠিয়েছেন। তখনই অনিবার্য হয়ে উঠেছে দেশের দ্বিখণ্ডীকরণ।

ডঃ পি এন চোপ্‌রা মন্তব্য করেছেন—'Only Gandhiji and Maulana Azad still opposed it'—(ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রীডম, পৃ: ৬৮)। আমাদের ভরসা ছিল গান্ধীজীর ওপর— নেহরু-প্যাটেলের ওপর তিনি কিন্তু ভরসা করতে পারেননি। এটা লক্ষণীয় যে, পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গায় উদ্বিগ্ন হয়ে নেহরু-প্যাটেলরা শান্তির আশায় সেই রাজ্যকে ভাগ করার একটা প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছিলেন— তার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং প্যাটেল। তাঁরা জানতেন, গান্ধীজী ও আজাদ এতে বাধা দিতে পারেন। সেই কারণে প্রস্তাবটা পাশ করানো হয়েছিল এমন সময় যখন গান্ধীজী বিহারে তাঁর শান্তিমিশনে ব্যস্ত এবং আজাদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁরা এটা জানতেও না পারেন। লিওনার্ড মস্‌লে মন্তব্য করেছেন—'And even it was passed, steps were taken to keep it secret and no meassage was sent to Gandhi to tell him what had taken place'—(দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজ, পৃ: ১০৮)।

অনেক পরে ব্যাপারটা জানার ফলে তাঁরা দুজনেই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ এটা এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত বয়ে এনেছিল। এক সময় আজাদ উদ্বিগ্ন হয়ে গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, কংগ্রেস গোটা ভারতের ক্ষেত্রে বিভাজন প্রস্তাব নিলে গান্ধীজী কি করবেন। উত্তরটা আজাদের কাছে ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক। গান্ধীজী বলেছিলেন— দেশভাগ করতে হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর— জীবিত অবস্থায় তিনি এটা ঠেকাবেনই—(ইন্ডিয়া উইন্স্ ফ্রীডম, পৃ: ১৬)।

কিন্তু প্যাটেল ও নেহরু আদৌ বসে ছিলেন না। প্যাটেলের সঙ্গে একটামাত্র বৈঠকেই মাউন্টব্যাটেন তাঁকে কাবু করে ফেলেছেন। বড়লাটের যুক্তিতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ক্রমে অন্য নেতাদেরও দেশভাগের অপরিহার্যতা নিয়ে বোঝাতে শুরু করেছিলেন— কংগ্রেসের 'আয়রণম্যান্' তখন গলে গেছেন যেন। আজাদ লিখেছেন— বড়লাটের সঙ্গে কথা বলার পর প্যাটেল কিন্তু গান্ধীর সঙ্গেও ঘণ্টা-দুয়েক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক করেছেন। তারপরেই এসেছে আজাদের জীবনে কঠিনতম আঘাত—কারণ তিনি শুনতে পেয়েছেন গান্ধীর কণ্ঠে প্যাটেলের ভাষণ, গান্ধীর কাছে পেয়েছেন প্যাটেলেরই যুক্তিগুলোই।

এরপর নেহরুও বড়লাটের ফাঁদে পা দিয়েছেন। তবে আজাদের বক্তব্য—এক্ষেত্রে আরও বড় ভূমিকা নিয়েছিল লেডী মাউন্টব্যাটেন— তাঁর মোহেই ক্রমে নেহরু দ্রবীভূত হয়েছেন। আজাদের ভাষায়—'She admired her husband greatly and in many cases, tried to interpret his thought to those who would not at first agree with him'—(ঐ, পৃ: ১৯৮)। এই কারণে ড: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন— গান্ধী প্রথমে প্যাটেলের এবং পরে লর্ড ও লেডীর প্রস্তাবে মত পরিবর্তন করেছেন— (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ: ২৯০)।

এর ফলে মৌলানা আজাদ ক্রমে নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে

করলেও তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দেননি। তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যেই অবিচল ছিলেন। এক কথায় বলা চলে— এর মুহূর্তের জন্যও তিনি মত বদল করেননি---(ডঃ সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়---ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পৃ: ৪৮৯)। তিনি লর্ড ওয়াভেলের মতোই বিশ্বাস করতেন যে, ধৈর্য ধরতে হবে—আরও বৈঠক, আলোচনা, প্রস্তাব রচনা ও বোঝাপড়ার দরকার আছে। বারবার সেই প্রয়াস হয়তো ব্যর্থ হবে, কিন্তু নতুন করে চালাতে হবে সেই প্রচেষ্টা। আজাদ লিখেছেন— এক জন্য না হয় আরও দুটো বছর নষ্ট হোত—কিন্তু একটা জাতির জীবনে এই সময়টা এমন কিছু বেশি নয়।

তিনি আরও লিখেছেন—মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব ও ওয়াভেলের প্রয়াসের মধ্যে কোন্‌টা দেশের মানুষের পক্ষে বেশি ভাল হোত, সেটা নিয়ে আজও বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু এটা ঠিক যে, কংগ্রেস নেতাদের উচিত ছিল আর একটু ধৈর্য্য ধরা।

কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস সফল হয়নি। দেশ ক্রমে ঝুঁকেছে দেশভাগের দিকেই। তাঁর জীবনীকার আর্স মালসিয়ানী লিখেছেন—'Azad, the inflexible advocate of Indian unity, was the saddest man at this turu of events'—(আবুল কালাম আজাদ, পৃ: ৭৮)।

তবু তিনি মরীয়া হয়ে গান্ধীকে বারবার ধরেছেন নেহরু ও প্যাটেলকে বোঝানোর জন্য। তাঁর তখন মনে হয়েছিল, একমাত্র তিনিই পারেন দেশকে সেই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে। ড: এস এম সেনের ভাষায়—'Azad made a last-minute appeal to Gandhiji'—(হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া, পৃ: ৩৩৫)। অনুরূপভাবে ডঃ শঙ্কর ঘোষও জানিয়েছেন যে, প্যাটেল ও নেহরুকে প্রভাবিত করার জন্য আজাদ বারবার গান্ধীকে অনুরোধ করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এটা শুধু গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ২ এপ্রিল (১৯৪৭) গান্ধী তাঁকে জানিয়েছেন, দেশভাগ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই—(স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পৃ: ৯২)।

আসলে, গান্ধীও ততদিনে ঘুরে গেছেন। তিনিও মেনে নিয়েছেন দেশভাগের অপরিহার্যতাকে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলা চলে— 'He suddenly veered round and supported the resolution for partitioning Bengal and Punjab in the session of AICC held on June, 1947'—(হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল, ২য়, পৃ: ৪১৪)।

তিনি জানতেন কেউ তাঁর কথা শুনবেন না। অনেক আগে তিনি সাংবাদিক দুর্গা দাসকে বলেছিলেন— দেশভাগ ছাড়া উপায় নেই, কারণ নেহরু ও জিন্না দুজনেই চান প্রধানমন্ত্রী হতে। আর

লাভ ও লোভের রাজনীতিই দেশভাগের ব্যাপারে কাজ করেছে। দ্বিতীয়- তৃতীয় সারির নেতারা ভেবেছেন—মন্ত্রী না হতে পারেন, ক্ষমতা কেন্দ্রের আশে-পাশে তো তাঁরা থাকতেই পারবেন। নিচের মহল ভেবেছে—দেশভাগ হলে নিত্য-সংঘাতের হাত থেকে বাঁচা যাবে, তাছাড়া তাঁরা উদ্বাস্তু হবেন না।

প্যাটেল সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন। শরৎবাবু একটা চিঠিতে লিখেছিলেন— প্যাটেল, গান্ধীরই 'Yesman'। উত্তরে গান্ধী লিখেছেন, প্যাটেল তাঁর 'no-man'। আর রাজেন্দ্রপ্রসাদ? গান্ধীর বক্তব্য—ডঃ প্রসাদ জানেন শুধু কেমন করে ওপরে উঠতে হয়।

আসলে, তিন পক্ষেরই তাড়া ছিল। মাউন্টব্যাটেন দেশে ফেরার জন্য ছিলেন ব্যগ্র। জিন্না জানতেন ক্যান্সার ও টিবি তাঁর শেষ সময়টা ঘনিয়ে এনেছে। প্যাটেল জানতেন তাঁর তখন বয়স ৭২, ক্ষমতায় না আসলে দিন ফুরিয়ে যাবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতারা বুঝেছেন, দেশভাগ হলেও ক্ষমতায় তো বসা যাবে। ডোমিনিক ল্যাপিয়ের লিখেছেন, জিন্নার মৃত্যু আসন্ন জানলে বড়লাট কি করতেন, কে জানে—(ফ্রীডম অ্যাট মিড্‌নাইট, পৃ: ১০৯)। কিন্তু লাভ ও লোভের রাজনীতিই দেশভাগের ব্যাপারে কাজ করেছে। দ্বিতীয়- তৃতীয় সারির নেতারা ভেবেছেন—মন্ত্রী না হতে পারেন, ক্ষমতা কেন্দ্রের আশে-পাশে তো তাঁরা থাকতেই পারবেন। নিচের মহল ভেবেছে—দেশভাগ হলে নিত্য-সংঘাতের হাত থেকে বাঁচা যাবে, তাছাড়া তাঁরা উদ্বাস্তু হবেন না। এই অবস্থায় আজাদ কি করবেন?

আরেকটা ব্যাপারেও আজাদ চেষ্টা করেছেন—সেটা নিয়ে অন্য কেউ চিন্তা করেননি। বড়লাটকে তিনি বলেছিলেন---দেশভাগটা ঠেকানো গেল না ঠিকই, কিন্তু দু'পায়ের ছিন্নমূল মানুষ প্রাণের দায়ে ছুটবেন ভয় থেকে অভয়ের দিকে। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য যেন বড়লাট মিলিটারীকে নামান।

সেটাও কিন্তু হয়নি—তার ফলে অবিরত ঘটেছে নারকীয় তাণ্ডব। মস্‌লে লিখেছেন—

'...Over 600,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. It they were girls, they were raped and, then, their breasts were chopped off. And if they were pregnant, they were disembowelled'—(ঐ পৃ: ২৭৯)।

তাঁরা ছিলেন কিছু নেতার লোভ, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, অধৈর্য ও বুদ্ধিহীনতার বলি। চেষ্টা করেও আজাদ এটা ঠেকাতে পারেননি।

তাই তিনি ছিলেন দেশভাগ---নাটকের পরাজিত নায়ক।

কেন স্বাধীনতা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ হয়েছিল?

শিবাশীষ রায়চৌধুরী

প্রশ্নটি হঠাৎই বুকে ধাক্কা দিল—তাই না? এরকম তো কখনও ভাবা হয়নি।

যাক, এবার প্রসঙ্গে আসা যাক। বৃটিশের ১৯৩৫ সালে যে ভারত শাসন আইন তৈরি হয়েছিল তার মধ্যেই দেশভাগের বীজ পোঁতা হয়েছিল, যা ক্রমে শাসক গোষ্ঠীর পরিচর্যা ''সাম্প্রদায়িক'' ভয়াল বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল; আর তার করাল গ্রাসে ভারতবর্ষ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যরাতে।

১৪ আগস্ট মধ্যরাতে সংসদে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরুর প্রথম প্রথম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বৃটেনের অর্থনৈতিক মন্দায় শত শত যোজন দূরে ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া, ভারতের অভ্যন্তরীণ বৃটিশ শাসন বিরোধী বিক্ষোভ— আন্দোলন তার কাছে অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে বৃটেনের নয়া শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারতকে স্বাধীনতা অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেও দিয়েছেন। সে সময় ভারতে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সর্বক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেওয়ায় অর্থাৎ কোনও বিষয়েই ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারার জন্য অ্যাটলি একপ্রকার রাগ করেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় জুন ১৯৪৮ ঘোষণা করেন।

তখন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি মার্চ ১৯৪৭ এ ভারতে আসেন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মাত্র ১৫ মাস সময় হাতে নিয়ে। ভারতে এসেই তিনি শাসন যন্ত্র ভেঙে পড়ার অজুহাতে ১০ মাস সময় এগিয়ে এনে মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্ব মিটিয়ে ফেলতে চাইলেন; যাতে তিনি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে অভীষ্ট বৃটিশ নেভির সর্বোচ্চ পদে যোগ দিতে পারেন। তাছাড়া, তাঁর কাছে Unpredictable গান্ধী ও Organised নেতাজী ভয়ের যেমন কারণ ছিল একদিকে; তেমনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ নেতৃত্বের দেশভাগের ব্যাপারে সহাবস্থান যদি হঠাৎ ভেঙে যায়— সেই ভয়ও ছিল অন্যদিকে। আবার, ১৯৪২ এ স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের অভিজ্ঞতাও তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। এক্ষেত্রে গান্ধী ও নেতাজীকে নিয়ে তার ভয় ছিল তাদের আন্দোলন সংগঠিত করার দক্ষতার জন্য; আর ভারতীয় নেতাদের তাদের খামখেয়ালীপনার জন্য। সেইজন্য সম্ভবত র‍্যাডক্লিফকে দিয়ে তিনি একদিকে যেমন দেশভাগের নির্মম ছুরিটি চালিয়েছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহের শুনানি ও তদন্তের মাধ্যমে; তেমনি অপরদিকে স্ত্রী-লেডিকে নেহেরুর দিকে 'মোল' হিসাবে এগিয়ে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো পর্বটি মিটিয়ে ছিলেন।

কিন্তু কেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭? তার কিসের এত ত্বরা ছিল? উল্লেখ্য ১৫ তারিখ ও আগস্ট মাস পৃথক পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে স্বাধীনতার দিন ঠিক হয়েছিল।

মাউন্টব্যাটেনের ১৫ আগস্টের কথা মনে পড়েছিল কেননা এই দিনেই জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল অর্থাৎ জাপানের পতনের দ্বিতীয় বার্ষিকী ছিল। তাছাড়া এশিয়ার এই দুটি দেশে ভবিষ্যৎ মনোমানিল্য বজায় রাখাও তার কূটনৈতিক চাল ছিল।

এছাড়াও আগস্ট মাসের গুরুত্ব বৃটিশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন— ১৭৬৭ সালের আগস্ট মাসেই দ্বিতীয় শাহআলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা-বিহার- ওড়িশার দেওয়ানি অর্পণ করেছিল।

কোম্পানির শাসনের অবসানে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকার অধিগ্রহণ করে ভারত শাসনের জন্য Act for better Govt. of India আইনটি পাশ করে ১৮৫৮ সালে এই আগস্ট মাসেই।

আবার ১৯১৭ সালের আগস্টে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তার ভারত নীতির লক্ষ্য একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

এবার দেখা যাক—এই ১৫ আগস্ট দিনটিতে জ্যোতিষের কি ভূমিকা ছিল। একথা সত্য যে নেহরু বা মাউন্টব্যাটেন কেহই জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু দেশবাসীর সেন্টিমেন্টের জন্য এই দিনটিতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কিছু কারসাজি করতে হয়েছিল নেহেরুকে। পাঁজির বিচারে ১৫ আগস্ট দিনটি অত্যন্ত অশুভ, এমনকী ১৩ ও; শুভ কেবল ১৪ আগস্ট। এবার স্বয়ং নেহেরু পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বড়লাটকে চিন্তা মুক্ত করলেন।

তিনি ঠিক করে দেন ১৪ আগস্ট শুভ সময় শেষ হবার আগেই গণ পরিষদের অধিবেশন বসবেই এবং মধ্য রাতের ১২টার ঘণ্টার ধ্বনির

মাঝেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। সেই জন্য ১৪ আগস্ট ঘড়িতে ১২টা বাজলেই নেহেরু শুরু করেন তার ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম বক্তৃতা ''মধ্যরাতের ঘণ্টা যখন বাজবে, সারা পৃথিবী যখন ঘুমাবে ভারত তখন নবজীবন ও স্বাধীনতার মধ্যে জেগে উঠবে''। (At the stroke of midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom.)

অন্যদিকে করাচিতে তখন রমজান মাসের উপবাস থাকায় জিন্না আহূত মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নৈশ ভোজ অর্থাৎ ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করতে হয়। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, দুই নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের কর্ণধাররা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। যার জন্য নেহেরু ১৪ আগস্টের শুভ সময়কে ধরতে মধ্যরাতের শেষের ঘণ্টার ধ্বনির ছন্দেই ভাগ্যে সঙ্গে ভারতের অভিসারের ছন্দ মেলালেন; আর জিন্না রমজানের উপবাস ভুলে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থাই করে রাখলেন।

এক্ষেত্রে জ্যোতিষের আর একটি প্রভাবের কথা বলব। ১৯৩১-৩২ সালে লেডি মাউন্টব্যাটেন প্যারিসের একজন জ্যোতিষীর কাছ থেকে জানতে পারেন—''আপনি একটি সিংহাসনের উপর বসে আছেন— অনেকটা রাজ সিংহাসনের মতো; আবার ঠিক রাজ সিংহাসনও নয়। আপনি সেই সিংহাসনে বসে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেশ শাসন করছেন।'' বাস্তবে ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট ও লেডি মাউন্ট ব্যাটেন তার স্ত্রী হিসাবে এবং সর্বোপরি নেহেরুর সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের (Love at first sight) মাধ্যমে কি দেশ শাসন করার অধিকারিণী হননি?

উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে অখণ্ড আত্মার শাশ্বত বাণীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে অঞ্জলি দিয়েছিলেন নেহরু লেডি মাউন্ডব্যাটেনের উষ্ণ হৃদয়ে।

তথ্যসূত্র :

Freedom at Midnight—কলিন্স ও লাঁপিয়ের।

The last days of the British Raj—লিওনার্ড মসলে।

ভারত বিভাগ—ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ—সুকুমার সেন।

হস্তান্তর—শংকর ঘোষ।

India Wins Freedom—মৌলানা আজাদ।

পামেলা মাউন্টব্যাটেনের স্বাক্ষ্য—পবিত্র কুমার ঘোষ (বর্তমান)।

Gandhi and the Partition—পি. সি. রায়চৌধুরী (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)।

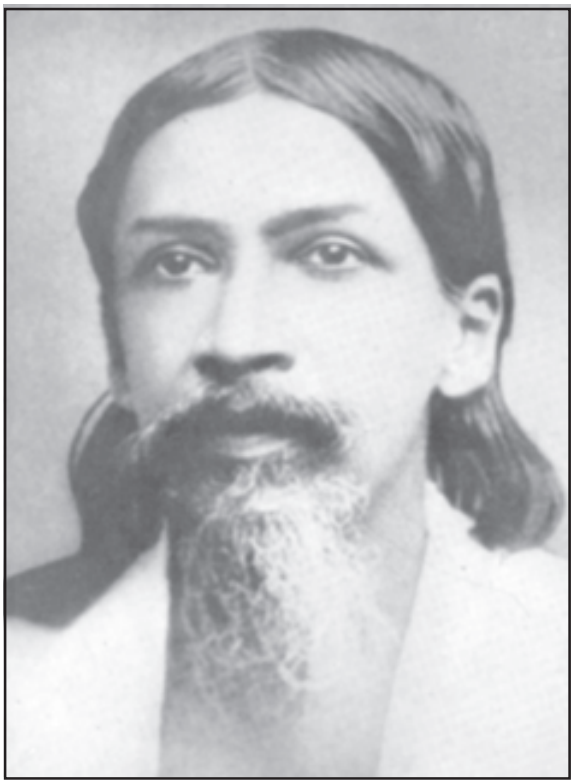

মুরারিপুকুর আখড়া : শ্রী অরবিন্দ, সনাতন ধর্ম ও ভারত উত্থান

ড. সুখেন্দু কুমার বাউর

মুরারিপুকুর আখড়া। মানিকতলার উপকণ্ঠে শ্রী অরবিন্দের পিতা ডা. কৃষ্ণধন ঘোষের এই সম্পত্তি। কৃষ্ণধনের দেহত্যাগের পর শ্রী অরবিন্দের তিন ভাই বিনয়ভূষণ, মনমোহন ও বারীন্দ্র এই সম্পত্তির মালিক হন। এটি একটি পোড়ো বাগানবাড়ি, পরিমাণ প্রায় ৭ বিঘা। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ এটিকে বিক্রি করে দিতে চান, কিন্তু তার ক্রেতা পাওয়া যায়নি। এতদিন পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় আইন বাঁচিয়ে, যথাসম্ভব শান্তির পথ ধরে কথা বলা হয়েছিল—নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা Passive Resistance এর কথা। মুরারিপুকুরের আদিপর্ব শুরু হয় যুগান্তর কাগজের হাত ধরে বৃটিশ শক্তির সশস্ত্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা।

'যুগান্তর' স্থির করে শুধু প্রচার নয় 'প্রয়োগ' হবে এবার। তখন স্থাপিত হয় মুরারিপুকুর আখড়া। বাগানটি বাঁদরে ভরা ছিল। এখানে এই আশ্রম বা আখড়ার গেরুয়াপরা বাঙালী যুবকরা থাকত। আসলে এখানে গোপনে বোমা তৈরির শিক্ষা চলত হাতে কলমে। আশ্রম করে গীতা, উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শন পড়াতেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনি বলতেন পড়াশোনার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি, দেশসেবা ও শেষমেশ স্বাধীনতা অর্জন, পুরো এক বছর ব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হোত ছাত্রদের। এখানে এসেছিল প্রথমে চার পাঁচজন— তারা বাড়িঘর ছাড়া। শ্রী অরবিন্দ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক সংগ্রহ ও ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এই আশ্রমের খরচ কে চালাবে? শাকসবজির ক্ষেত, হাঁস ও মুরগি পোষা, কিছু বন্ধুর মাসিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, এতে খরচ চালাবার ইচ্ছা চলে। খাওয়া-দাওয়া ছিল ভাত, ডাল, তরকারি, অধিকাংশ দিন ডালের মধ্যেই দু চারটি আলু ফেলে। সময়াভাবে খিচুড়ী। চা খাওয়াও হোত। বারীন্দ্র চা বানাতেন ভালই। খাওয়া হোত ভাঙা নারকোলের মালায়। বাগানে ছিল আম, জাম, কাঁঠালের গাছ। আশ্রমের প্রত্যেকের ছিল এক একটা নারকেল মালা ও মাটির সানকি যা আহারের পর ধুয়ে মুছে রাখা হোত। কাপড় নিজেদের সাবান দিয়ে কেচে নিতে হোত।

এমন সময় বাংলার নানা জেলা হতে ২০ জন ছেলে এসে পড়ে। ৫/৭ জন কাজকর্ম করত, আর অপেক্ষাকৃত ছোটরা পড়াশোনা করত। বিষয় ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাসচর্চা আর কর্মের মধ্যে বিপ্লব আয়োজন। পুলিশের ও গোয়েন্দাদের হাত থেকে বাঁচতে ছাত্রদের একে অপরের নাম জানা নিষিদ্ধ ছিল। নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করা হোত। তিনজন শিক্ষক—বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, ও উল্লাসকর দত্ত। বারীন্দ্র—সাধারণভাবে স্কুল পরিচালনা, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য তদারকি করতেন। উপেন্দ্র পড়াতেন ধর্ম ও বিপ্লবের ইতিহাস। উল্লাসকর বিস্ফোরক সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হেমচন্দ্র দাশ যিনি প্যারিসে এটি শিক্ষালাভ করেন। তিনি বোমা ভরার কাজ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের বাড়িতে করতেন। মুরারিপুকুরে নিয়মিত আসতেন না। এম এস এখানকার বোমার মশলার সঙ্গে এক্সপ্লোসিভ ম্যানুয়ালটির সঙ্গে প্যারিসে পুলিশের পাওয়া রুশ বিপ্লবী সাত্রানস্কির ম্যানুয়ালের সঙ্গে মিল।

আখড়ার ছাত্রদের শপথ নিতে হোত বাংলায় এবং সংস্কৃতে, তরবারি ও গীতা ছুঁয়ে। 'হে তরবারি— শক্তির চিরন্তন প্রতীক। জানিয়াছি তোমার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে আদ্যাশক্তি ভারতমাতা জনার্দনী করালির আত্মার মূর্তি। তোমাকে আমার মস্তকে স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছি অসুর বিনাশের জন্য।'

মুরারিপুকুরের বোমা মামলায় জড়ানো হয় শ্রী অরবিন্দকে। কিন্তু তিনি ছাড়া পান ব্যারিস্টার শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের সহায়তায়। এই মামলার খরচের জন্য টাকা তোলা হয় ১৫০০০ টাকা। শ্রী অরবিন্দের বোন ও সরোজিনী দেবীর আবেদনে যোগাড় হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই দুচার টাকা করে দিয়ে এর মধ্যে এগার হাজার টাকা জোগাড় করেন। চিত্তরঞ্জন বিনা অর্থেই কেস চালান। মুক্ত হন শ্রী অরবিন্দ। বারীন্দ্র শপথ করে বলেছিলেন শ্রী অরবিন্দ বোমার বিষয় ইত্যাদি জানতেন না।

শ্রী অরবিন্দ জেলে। মুখ চিন্তাহীন। টলটলে মুখ হাসিমাখা। চোখদুটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ, নখ হয়েছে আধ ইঞ্চি লম্বা। চুল দাড়ি লম্বা। তেল না ব্যবহার করেও যোগপ্রভাবে মাথার চুল তেল চকচকে। জেলে কাটাতেন ধ্যান করে। আখড়ার মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা শ্রী অরবিন্দ। তিনি বলেছেন, 'বৃটিশ

গভর্নমেন্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল— আমি শ্রীভগবানকে পাইলাম। নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচফুট প্রশস্ত কারাগৃহ। যেন কংসের কারাগার। আগুনের চুল্লি। পিপাসা মেটানোর জন্য পাশের বালতিতে রাখা জল। শোবার জন্য দুটি কম্বল। মাটিতে শয্যা। নিত্যকর্ম এই খাঁচায়। গৃহসামগ্রী একটি বাঁকা থালা, বালতি দুটি আলকাতরা মাখানো টুকরী। তখন গরমকাল। আহার অখাদ্য। খোলাভরা মোটা চালের ভাত। কাঁকর, পোকা চুল ময়লা ভর্তি। আস্বাদ হীন জলভর্তি ডাল। তরকারিতে শাকের সঙ্গে সেদ্ধ ঘাসপাতা। তৃষ্ণা ও ঘৃণা জয় করলেন অরবিন্দ।

নির্জনবাসে অনুভূতি লাভ হলো। জেলের উঁচু দেওয়ালে তিনি ঘরে বন্দী নন, তাঁকে ঘিরে শ্রীকৃষ্ণ। সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণ। কম্বল যেন শ্রীকৃষ্ণ, জড়িয়ে ধরেছেন শ্রী অরবিন্দকে বন্ধু প্রেমাস্পদের মতো। গাছ—শ্রীকৃষ্ণ, গরাদ শ্রীকৃষ্ণ। জেলের চোর-জুয়াচোর-খুনী—তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহ সব নারায়ণ।

শ্রী ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ শ্রী অরবিন্দকে বাণীতে বললেন, 'তুমি পেয়েছ বাণী, জাতিকে দেবার জন্য—যে বাণী তাকে উঠতে সাহায্য করবে।

এই তরুণের দল, এই নূতন মহাশক্তিশালী জাতিই, আমার আদেশে উঠছে।...এরাই ভবিষ্যৎ কর্মভার গ্রহণ করবে। যেন সাধনার সঙ্গে তিতিক্ষা ও কষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরীয় শক্তির মেলবন্ধন হলো।...

উত্তরপাড়া অভিভাষণে শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাণীটি হলো—'যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয়, পরন্তু সমস্ত জগতের জনেই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগৎসেবার জন্যে।... আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে সকল বস্তুতে বিরাজ করছি, দেখিয়েছি, যে আমি সর্বত্র সকল মানুষ, দেখিয়েছি যে এই আন্দোলনের মধ্যেও আমি রয়েছি।...শক্তি আবির্ভূতা হয়েছে এবং জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বহুদিন পূর্ব থেকেই আমি এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করছিলাম, এখন সময় এসেছে। এখন আমিই একে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করব।"

সাধনের সঙ্গে জেলে বসেই প্রবন্ধমালা ও কবিতা লিখতেন শ্রী অরবিন্দ। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ২৩ আগস্ট শ্রী অরবিন্দ বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' প্রকাশ করলেন। এতে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখলেন যা জাতির মর্মকথা।

'আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মপ্রচার ও সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগ ধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী আর্য জাতির বংশধর। আর্যশিক্ষা ও আর্যনীতির অধিকারী। এই আর্যভাবই আমাদের কুলধর্ম, জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্যশিক্ষার মূল— জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসংস্কার ও ভ্রান্তিসংকুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্যশিক্ষাও নীতিহারা। আমরা আর্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল পদদলিত ও দুঃখ পরম্পরা প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে। জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য। জাতিরক্ষার উপায় আর্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী শক্তিমান, বিনীত হয় সমস্ত জাতিকে, বিশেষত যুবক সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্যভাব উদ্দীপক কর্মপ্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।...

জাতিধর্ম অনুষ্ঠানে যুগধর্মসেবা সহজসাধ্য হইবে। এই যুগশক্তি ও প্রেমের যুগ।...

শক্তিস্ফুরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎ কর্মপ্রয়াসী হইবে তখন বুঝিতে হইবে জগতের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ধর্মবিরোধিনী অসুরশক্তির সংকোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপ শিক্ষাও বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম ও জাতিধর্ম সাধিত হইলে জগৎময় সনাতন ধর্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্যদেশ সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞান ধর্ম শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনতমস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্যে ভারতবাসীর জাগরণ, আর্যভাবে নবোত্থান।

শ্রী অরবিন্দের গুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলে অবশ্য বলেছিলেন মারামারি কাটাকাটি ছাড়াই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তিনি ধ্যানযোগ সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও আগে তিনি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত স্বাধীন ভারতের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রী অরবিন্দকে শ্রদ্ধা বিনম্র প্রণতি জানাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী অসুরবাদী বৃটিশ সরকার শোষক। তাদের মূল উচ্ছেদ করতে হিংসার আশ্রয় নিলেও শ্রী অরবিন্দ ভারত ও মানবজাতির মূল উদ্দেশ্য সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ও ভারতকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। কঠোর তপস্যা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের চির প্রার্থিত স্বাধীনতা। আজ তপস্যায় জাগরূক নব উত্থিত ভারত বিশ্বসভায়। অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য, বিজ্ঞানের বরদান এবং জাতীয়তার ঐক্যের বলে গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রবোধে আবার নবজাগরুক হোক্---এই লক্ষ্যে সর্বভারতবাসীকেই নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে। পরম্পরার লক্ষ্য— শিক্ষা, ঐতিহ্য অবলোকন, পুনর্মূল্যায়ন, প্রেমের সঙ্গে প্রয়োগ, ঐক্যসূত্র গঠন ও নীরব সেবা।

শ্রী অরবিন্দ ভারত ও মানবজাতির মূল উদ্দেশ্য সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ও ভারতকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। কঠোর তপস্যা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের চির প্রার্থিত স্বাধীনতা। আজ তপস্যায় জাগরূক নব উত্থিত ভারত বিশ্বসভায়। অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য, বিজ্ঞানের বরদান এবং জাতীয়তার ঐক্যের বলে গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রবোধে আবার নবজাগরুক হোক্—এই লক্ষ্যে সর্বভারতবাসীকেই নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে।

তথ্যপঞ্জী

১. উত্তরপাড়া অভিভাষণ—শ্রী অরবিন্দ
২. কারাকাহিনী—শ্রী অরবিন্দ
৩. শ্রী অরবিন্দ স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
৪. নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরারিপুকুর বাগান কথা)

[লেখক : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক]

ভগৎ সিং : ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লববাদের প্রতীক

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত মাঝে মাঝেই সন্ত্রাসবাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও সুস্থিতির উপর প্রচণ্ড আঘাত নেমে এসেছে। ক্ষমতাসীন শাসক দল ও তার সহযোগী দলগুলি রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থে বিভোর হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী কোনও শক্তির কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেননি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বৃটিশ শাসকবর্গ ভারতের জাতীয় বিপ্লববাদীদের সন্ত্রাসবাদী নামে চিহ্নিত করেছিলেন। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক ও 'সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে বিপ্লবীদের মহান ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন ভারতের বিপ্লবীরা নিছক সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনের জন্য তাঁরা মুক্তি যজ্ঞের উপাসক ছিলেন এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন।

২০০৭ খৃস্টাব্দে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সার্ধশতবর্ষপূর্তি ও ভগৎ সিং-এর শতবর্ষ সমারোহ উদযাপিত হয়েছে। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এত বড় মাপের আঘাতের সম্মুখীন হয়ে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি টলমল করে উঠেছিল। এর পঞ্চাশ বছর পর ১৯০৭-এ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে জাতীয় বিপ্লববাদ প্রাণবন্ত আকার ধারণ করে। শ্রী অরবিন্দ The Doctrine of Passive Resistance প্রবন্ধগুচ্ছে আত্ম-পরিচয় আত্মশক্তি ও সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি তুলে ধরেছিলেন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে একটি 'জাতির প্রাণবায়ু' (the life-breath of a nation) বলে অভিহিত করেছেন (বন্দেমাতরম ১১ এপ্রিল ১৯০৭)। ওই বছরের ডিসেম্বরে শ্রী অরবিন্দ ১৯০৭ কে জাতীয় রাজনীতির নির্ণায়ক বছর (a turning point of our destiny) বলে উল্লেখ করেন।

আর ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলায় ভগৎ সিং জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময় পাঞ্জাব বিপ্লববাদের স্নায়ু কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাঞ্জাবে আর্য সমাজের বিশেষ প্রভাব ছিল। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবে বৃটিশ বিরোধী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর একান্ত সহযোগী ছিলেন ভগৎ সিং-এর পিতৃব্য অজিত সিং। বৃটিশ শাসককুল আশঙ্কা করেছিলেন পাঞ্জাবে সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ১৯০৭ সালের মে মাসে লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং-কে সুদূর ব্রহ্মদেশে মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় ভগৎ-সিং-এর পিতা কিষেণ সিং জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভগৎ সিংকে বিপ্লবের সন্তান বলা চলে। লাহোরে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার পাঞ্জাবে অনুশীলন সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কার অনুশীলন সমিতির অগ্রগণ্য নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল-এর সঙ্গে ভগৎ সিং এর পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নবপর্যায় শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারত গণ আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী জাতীয় গণ আন্দোলনের সময় তরুণ ভগৎ সিং ভি এ ডি কলেজে অধ্যয়ন ছেড়ে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই কলেজেই তিনি শুকদেব, যশপাল প্রমুখ বিপ্লবীদের সতীর্থরূপে পেয়েছিলেন। শীঘ্রই ভগৎ সিং লাহোর থেকে কানপুরে চলে এলেন। এখানে গণেশশংকর বিদ্যার্থীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ মিলল। গণেশশংকর বিদ্যার্থী গান্ধীজির অনুগামী ও কংগ্রেস দলের

নেতা হলেও বিপ্লবীদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। গণেশশংকরের বাসগৃহে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয় কুমার সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুললেন।

বিশের দশকে পাঞ্জাবে জঙ্গি জাতীয়বাদ দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—যুব আন্দোলন এবং কৃষক শ্রমিক আন্দোলন। যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি সংগঠন বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়—এগুলি হলো হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সোসালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (HRSA) ও নওজীবন ভারত সভা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, (HRSA)-এর পূর্বসূরী ছিল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HRSA)। ১৯২৪ সালে এইচ আর এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগৎ সিং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। তবে ১৯২৫ সালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় এইচ আর এ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে পড়ায় উত্তরপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

অনতিবিলম্বে ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবীগণ, যথা রামকিষেণ, ভগবতীচরণ ভোরা, শুকদেব পাঞ্জাবে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন এবং ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে পাঞ্জাবে নওজীবন ভারত সভা গড়ে তুললেন। ভগৎ সিং এই সংস্থার সম্পাদক হলেন। যুব আন্দোলনকে গণমুখী ও সক্রিয় করে তোলার জন্য মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক স্তরে শাখা স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত নওজওয়ান সভা পাঞ্জাবের সংগঠনের আদলে গড়ে ওঠে। ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ভগৎ সিং সচেষ্ট হন। ১৯২৮ সালে ভগৎ সিং ও শুকদেব লাহোরে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। এই সমিতির তরুণ সদস্যদের মধ্য থেকে তরুণ বিপ্লবীদের নির্বাচিত করা হোত। যুব আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীগণ বিপ্লববাদের প্রসারের জন্য একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নজর দিলেন। এরই পরিণতি হলো ১৯২৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা গ্রাউন্ডে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন নামে এক বৈপ্লবিক সংস্থার আত্মপ্রকাশ। এই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠান হলো হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। এই নতুন বৈপ্লবিক সমিতির কাজে যুক্ত ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, শুকদেব, শিববর্মা, যতীন দাস প্রমুখ। তবে নিঃসন্দেহে ভগৎ সিং ছিলেন এই সংস্থার (এইচ এস আর এ) মধ্যমণি—একাধারে তাত্ত্বিক নেতা ও মুখ্য সংগঠক। এই সংস্থার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিনাশ সাধন ছিল আপাত উদ্দেশ্য। তবে এখানেই থেমে থাকা নয়। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতবাসীর প্রকৃত মুক্তিসাধন। বৈপ্লবিক সমিতির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল আগ্রা, তবে এখান থেকে ভগৎ সিং ও বিজয় কুমার সিং বিভিন্ন প্রদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব পেলেন।

বিপ্লবের জন্য ভগৎ সিং দু' ধরনের কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন---প্রচার ও প্রতিরোধ। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা 'প্রতাপ' 'কীর্তি' প্রমুখ পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরেন। এ ছাড়া এইচ এস আর-এর ইস্তাহার, বোমার দর্শন, আত্মজীবনী প্রভৃতি রচনায় ভগৎ সিং তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। দুঃখের কথা কারাগারে থাকার সময় ভগৎ সিং-এর লেখাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

এদিকে সাইমন কমিশন (১৯২৭) বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। লাহোরে প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং দিন কয়েক পর ১৯২৮ খৃস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর প্রয়াত হন। জনপ্রিয় নেতার শোচনীয় দেহাবসানে তরুণ বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং পুলিশের কর্মকর্তা জে. এ. স্কটকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল না হলেও স্কটের সহযোগী অফিসার আই জি সান্ডার্স নিহত হলেন।

লাহোর হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পর পাঞ্জাবের বিপ্লবীগণ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ৮ এপ্রিল (১৯২৯ খৃস্টাব্দ) বোমা নিক্ষেপ করেন। এই বোমা নিক্ষেপের আপাত কারণ ছিল গণ আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কর্তৃক উত্থাপিত জন নিরাপত্তা বিল ও শিল্প বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত হয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়লেন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান সমিতির অন্যান্য সদস্যগণও গ্রেপ্তার হলেন। তাঁরা বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্দীরা ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে সামিল হলেন। লাহোর জেলে দীর্ঘদিন অনশনের পর অন্যতম অভিযুক্ত বিপ্লবী যতীন দাস আত্মাহুতি দিলেন। দীর্ঘ এক বছর মামলা চলার পর ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ৭ অক্টোবর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হয়। এই রায় অনুসারে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২৩ মার্চ ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দান করলেন।

সমস্ত দেশজুড়ে ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আলোচ্য সময়ে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপ্তি দেখে শঙ্কিত হয়ে বৃটিশ সরকার গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। সমগ্র দেশে ভগৎ সিং-এর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবি ওঠে। এমনকী গান্ধীজীর ওপরেও চাপ সৃষ্টি করা হয়। গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরউইনকে প্রাণদণ্ডের দিন স্থগিত করার আবেদন জানালেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে।

প্রসঙ্গত বলা হয়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী হওয়ায় হিংসাত্মক পথের অনুগামীদের পক্ষ সমর্থন করতে চায়নি।

ভগৎ সিং ছিলেন এই সংস্থার (এইচ এস আর এ) মধ্যমণি—একাধারে তাত্ত্বিক নেতা ও মুখ্য সংগঠক। এই সংস্থার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিনাশ সাধন ছিল আপাত উদ্দেশ্য। তবে এখানেই থেমে থাকা নয়। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতবাসীর প্রকৃত মুক্তিসাধন।

রক্তের ঋণ রক্ত দিয়েই শোধ করতে হয়

শিবাজী গুপ্ত

সংখ্যালঘু শূন্য পাকিস্তানে মোল্লায়-মোল্লায় ক্রমাগত হানাহানির প্রেক্ষিতে একটি সংবাদপত্রের 'অবিরল রক্তস্রোত' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেও একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পাকিস্তানের এই হাল বোধহয় নিয়তি নির্দিষ্ট। দেশভাগের আগে মানচিত্রে যেসব জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে এবং তাদের গুরুত্ব ও প্রাধান্যের কারণ মুখস্থ করতে গলদঘর্ম হয়েছি, দীর্ঘ ৬২ বছর পর সেসব জায়গাগুলি যে পুনরায় সংবাদপত্রের পাতায় জ্বলজ্বল করে উঠে আসবে তা কেউ কি ভেবেছিল? ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীন নিদর্শন মহেন্‌জোদাড়ো ও হরপ্পা, তক্ষশীলার মতো জ্ঞানপীঠ, আর হিংলাজ ও শর্করার মতো সতীপীঠ যে দেশের বুকে অবস্থিত, সে ভূমিখণ্ডে বর্তমানে অবিরাম রক্তের হোলিখেলা বেদনাদায়ক বৈ কি!

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেও ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় বিভাজনের দরুন ওইসব স্থানগুলি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এখন যাদের অধিকারে তারা সে সভ্যতা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করে না; গৌরববোধ করে না।

বর্তমানে প্রায় বিস্তৃত অনেক স্থানই পাকিস্তানী সন্ত্রাসী তালিবানীদের দৌরাত্ম্যের দরুন খবরের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। সেসব স্থানের কাছেই পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। সেসব কেন্দ্র থেকেই পাক- সেনাবাহিনী ভারতের দিকে আণবিক অস্ত্র তাক করে বসে রয়েছে। আর আলকায়দা, তালিবান, লস্কর তৈবা ইত্যাদি নামধারী সন্ত্রাসীরা সেসব কেন্দ্র থেকে আণবিক অস্ত্র হাতাবার তালে রয়েছে। পাকিস্তানের আণবিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত স্থানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

পেশোয়ার, কোহাট, চকলালা, সিয়ানওয়ালী, তক্ষশীলা, আটক, ওয়াজিরিস্তান, রফিকুল, সারগোধা, কামোক প্রভৃতি। এসব অস্ত্রভাণ্ডার তালিবানদের হাতে পড়লে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে, তা ভাবাও যায় না।

একথা ভুললে চলবে না যে, উল্লিখিত স্থানগুলি ছাড়াও বর্তমানে পাকিস্তানে যেসব জায়গা মানব বোমা, গাড়ি বোমা ও রকেট আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পরে সে জায়গাগুলিতেই ১৯৪৭ সালে হাজারে হাজারে নিরপরাধ হিন্দু-শিখ নরনারী শিশু ধর্মান্ধ ঘাতকদের নির্মমতা, বর্বরতা ও পৈশাচিকতার শিকার হয়েছিল। সেসব রক্তাক্ত কাহিনী ইতিহাসের পাতা জুড়ে রয়েছে। নমুনাস্বরূপ তার কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) লাহোর অমৃতসর-রাওয়ালপিণ্ডি শহরে নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন- অগ্নিসংযোগ : মূলতানে তিন ঘণ্টায় ১৫০ জনকে হত্যা—প্রায় সবাই হিন্দু।

(২) পাঞ্জাবের গ্রামেগঞ্জে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা পৈশাচিকতার বেনজির ইতিহাস, রাওয়ালপিণ্ডি,

পাকিস্তানে যেসব জায়গা মানব বোমা, গাড়ি বোমা ও রকেট আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পরে সে জায়গাগুলিতেই ১৯৪৭ সালে হাজারে হাজারে নিরপরাধ হিন্দু-শিখ নরনারী শিশু ধর্মান্ধ ঘাতকদের নির্মমতা, বর্বরতা ও পৈশাচিকতার শিকার হয়েছিল।

আটক, ঝিলাম মূলতান জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে নির্বিচারে শিখদের জবাই, নারী শিশু কারও রেহাই নেই।

(৩) ২৬ আগস্ট ১৯৪৭—ভাওয়ালপুরে ৪৪৫ জন হিন্দু শিখ হতাহত। অন্যান্য শহরে হতাহতের সংখ্যা : হাসিলপুর ৩৮৪ জন, সাদিকপুর, খয়েরপুর এবং উধমপুরে ১০০০ জনের মতো।

(৪) ৭.৯.'৪৭ --- গুজরানওয়ালা জেলার বাজিকে তারার গ্রামে একশ জনের উপর শিখ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে খুন করা হয়েছে।

(৫) ১০.৯.'৪৭—ঝিলাম জেলার পিণ্ড-দাদন খান তহশিলের গ্রামে হিন্দু-শিখদের পাইকারী হারে ধর্মান্তরিত করে তাদের গোমাংস খাওয়ানো হয়েছে। অনেক ব্রাহ্মণ কন্যাকে মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভামবিপুরে ছয় থেকে সাত হাজার হিন্দু-শিখকে হত্যা করা হয়েছে। পীরমহল মণ্ডিতে খুন হয়েছে ২০০০ জন, আর কামালিয়ায় প্রায় ৭০০০ জন।

(৬) টোবা টেক সিং-এর বাড়ির সামনে একটি হিন্দু-শিখ জাঠা থেকে ৪০০ মহিলাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যে ট্রেনে করে বাকী হিন্দুরা ভারতের দিকে আসছিল তার উপর মুসলিম গুণ্ডারা আক্রমণ করে বহু হতাহত করে।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে এ ধরনের নৃশংসতা ও বর্বরতার কোনও সীমা সংখ্যা নেই। তারই পরিণতি ছয় লক্ষাধিক নরনারীর নির্বিচার হত্যা এবং লক্ষাধিক নারী ও বালিকা অপহরণ। এই সময় মিঃ জিন্না ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার ও উদাসীন। দাঙ্গা প্রতিরোধে তিনি কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সেসব কুখ্যাত স্থানগুলিই বর্তমানে তালিবানী আক্রমণ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হচ্ছে।

দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তখনও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বালুচিস্তানের নেতৃবৃন্দ— নবাব মুহম্মদ খান, খান আবদুল সামাদ খান, মৌলবী আবদুল্লা জান প্রমুখ বালুচিস্তানের পাকিস্তানভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। উপরন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুস্তুভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে স্বাধীন পাঠান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেছে। বোঝা যাচ্ছে তারা তাদের স্বপ্ন এখনও ভুলে যায়নি।

বর্তমানের অবিরল রক্তস্রোত সেই অতীত অপকীর্তির প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া নয় তো! সৃষ্টিকালীন পাপের প্রতিফল নয় তো!

পাকিস্তান না বলে পাপীস্তান বলাই সঙ্গত। পাপ নাকি বাপকেও ছাড়ে না। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর অশ্রুপাত এবং অভিশাপে যে রাষ্ট্র পয়দা হয়েছে, তা দিনে পাঁচবার কেন? ৫৫ বার আল্লা-আল্লা বলে চেল্লালেও আল্লার কানে পৌঁছবে না। বিধর্মীর রক্তপাতে রক্তপিপাসা মেটাবার সুযোগ যখন নেই, স্বধর্মী ভাই-বেরাদরের রক্তেই তখন রক্তপিপাসা মেটাতে হয়।

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তেষ্টা মেটাতে স্বধর্মী ও বিধর্মীর রক্তে পার্থক্য করে না।

জেগে ওঠা চাই আত্মবিশ্বাসে

প্রতিটি জীবনের মধ্যে রয়েছে লুকানো শক্তি। তা জানা এবং বোঝা যায় জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে। একথা মনে রেখে কেউ এগোতে চান দ্রুত। আবার কেউ ধীরেসুস্থে এগোন সবদিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে। নিজেকে নিয়ে কেউ কেউ খুব ব্যস্ত। আবার কেউ খুব সহজভাবে জীবনের মুখোমুখি হন। তবে প্রায় প্রত্যেকেই আত্ম-পরিচয়টা ভালোভাবে জানেন। সেই পরিচিতি ছড়িয়ে দিতে চান। কখনও নিজেকে বড়ো করে দেখেন। কখনও খুব সাধারণ ভাবেন নিজেকে। পরিচিতির মধ্যে একটা গণ্ডী কেটে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা চলে। সেই গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বড়ো করে দেখার ভাবনাও কাজ করে। অনেকরকম ভাবে সাজিয়ে তোলা এবং বিশেষণে ভূষিত করার প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রত্যক্ষ ব্যাপার ঘটে। আত্মগরিমা কীর্তনে পটুত্ব অর্জনের দিকে প্রবল আগ্রহ একসময় মনের মধ্যে সংকীর্ণতা জাগায়। নিজের থেকে কাউকে বড়ো মনে হয় না। ক্রমাগত একটা ভাবনাই সক্রিয় থাকে আমি সব জেনেছি। আমি সব পারি, আমি অসীম ক্ষমতাধর। মনের মধ্যে আত্মগর্বের চর্বি যখন জমে তখনই দেখা দেয় সমস্যা। চারপাশে স্বাভাবিক মন ও বুদ্ধি নিয়ে তাকিয়ে নিজের অবস্থান বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে না। একটা সংকীর্ণজগৎ বা সীমাবদ্ধ ধারণার মধ্যে অনবরত পাক খাওয়া চলে। যেন হয়ে ওঠে কুয়োর ব্যাঙ।

কূপমণ্ডুক হবে না জীবনে—এমন হিতোপদেশ আমরা অনেক প্রাজ্ঞজনের কাছে শুনলেও নিজেদের মন ও মানসিকতাকে ওই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে পাক খাওয়ানোর ভিতর স্বস্তি বা সুখ পেতে চেয়েছি। সীমার মাঝেও অসীম থাকে তা বুঝবার গরজ দেখা যায় না। মনের চারপাশে গণ্ডীকাটা হলে পরিচিতির যে চৌহদ্দি থাকে তার বাইরে যাওয়ার মতো সাহস অর্জন করা যায় না। নতুন কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও থাকে না। একই আবর্তে পাক খাওয়া ক্রমাগত। সেটাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেবে আত্মগর্বে মেদ বৃদ্ধি ঘটবে। আর যিনি বুঝবেন ওই অন্ধকার বন্ধন দমবন্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করছে, তিনি মুক্ত আলো বাতাসের জন্যে ব্যাকুল হবেন। কুয়োর ব্যাঙ ইচ্ছে করলেই কুয়োর বাইরে আসতে না পারুক, সে চেষ্টা চালাতে পারত বৈকি। দেয়াল বেয়ে উঠে বাইরে আসার চেষ্টা করত। দু চারবার পড়ে যেত। তারপরে একসময় সে অনেক উঁচুতে উঠে আসত। ঐতো খোলা আকাশ। চারপাশ অন্যরকম। সে আরেকটু উঠল। এবার সে পৌঁছে গেলো মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে। পিছনে পড়ে রইল অন্ধকার কুয়োর অতীত। ব্যাঙ নিজেকে বলতে পারল, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। মনে মনে নয়, সত্যি সত্যিই।

ব্যাঙটি যখন পারল মানুষ কেন পারবে না? সে যদি অলস প্রকৃতির হয় উদ্যোগহীনতা তাকে ঘিরে ধরবে। জীবনের নানারকম সমস্যা একটার পর একটা চেহারা নিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলবে। সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা কঠিন। কুয়োর ব্যাঙ লাফ দিতে দিতে একসময় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। কোনও কারণে কুয়োতে সে বন্দী হলেও তার মন মেনে নিতে পারেনি সেই বন্দিত্ব। কিন্তু যে ব্যাঙ কখনও বাইরের পৃথিবীর খবর নিতে চায় না, কুয়োর মধ্যে বসবাসে অসুবিধে হয় না, সে কেন খামোকা আসতে চাইবে অজানা বড়ো গর্তের মধ্যে? 'এই তো বেশ আছি' এই মনোভাবটাকে স্বচ্ছন্দে লালন করা যায়।

আমরা অনেকেই তো ওই কুয়োর ব্যাঙের চরিত্র বজায় রেখে নিজেদের অনেক সময়েই সবজান্তা তালেবর ভাবি। ছোট জগতে থাকলে মনটাও ছোট হতে বাধ্য। কিন্তু যার বিপুল বিশ্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই সে তো নিজের চারপাশের বাঁধা চৌহদ্দির মধ্যে পরমানন্দে পাক খেয়ে চলবে। জীবনের ধ্যান জ্ঞান তৃপ্তি অতৃপ্তি মিলেমিশে থাকবে তার মধ্যে।

যারা প্রাজ্ঞদর্শী তাঁরা বলেছেন, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসো। মনকে বড়ো জগতে ছড়িয়ে দাও। মন একেবারে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করতে যেমন পারে তেমনি অনন্ত আকাশে মুক্তির বাতাসে অসীম জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে অন্যভাবে খুঁজে নেওয়ার কথা ভাববে। সেটাই তো আত্মবোধন মন্ত্র। সেজন্যে কি চাই? ধৈর্য শিক্ষা মুক্ত দৃষ্টি। নিজেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জাগিয়ে রাখার কথা ভাবতে হবে। যাঁরা মহাজ্ঞানীজন যাঁদের আমরা জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই পরম বিশ্বাসে তাঁরা নিজেদের পরিচিতিকে শূন্যে পরিণত করেছেন। হয় তাঁদের পরিচিতি অসীম। যাকে কোনও গণ্ডীতে আটকানো যাবে না। কিংবা তাঁদের পরিচিতি শূন্য। যা ধরাছোঁয়া সম্ভব নয়। আমরা কজন পারবো নিজেদের ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে? পারা কঠিন। কিন্তু একটা কাজ করা সম্ভব। বিশ্বাসকে সম্বল করে এগোন যায় জীবনের পথে। গভীর বিশ্বাস আর দৃঢ় সংকল্প যে কোনও জীবনের মস্ত বড় শক্তি। তার মাধ্যমে অনেক কঠিন বাধা পেরোন সম্ভব। দুর্গম পথ পেরোনো যায়।

মহাজনরা বলছেন, তুমি একটা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছো। তোমার মনে বিশ্বাস আছে গাছটা তোমার ঘাড়ে পড়বে না। তুমি একটা চেয়ারে বসে আছো, তোমার মনে ভরসা আছে চেয়ারটা হঠাৎ ভেঙে তোমাকে আহত করবে না। এই বিশ্বাস যদি জীবনের মধ্যে থেকে অর্জন করতে না পারা যায় তাহলে অস্তিত্ব হয়ে ওঠে বিড়ম্বনাময়। আমরা অনেকেই তা চাই না। কিন্তু পাকেচক্রে সেপথেই আমাদের যেতে হয়। মনকে গণ্ডীবন্ধ করে আত্মসাফাই গেয়ে যাই ক্রমাগত। সেখানেই সংকট, বিড়ম্বনার শুরু।

চলার পথে বাধা তো আসবে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে/তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরবো না। আমি ভয় করবো না।' এই তো সংকল্প ও বিশ্বাস। দৃঢ় প্রত্যয়বদ্ধ মন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোয়। আত্মগর্ব নিয়ে নয়। কোনও কিছু করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়। সেজন্যে এগোতে চায় শ্রম সংগ্রাম-সাধনাকে মূলধন করে। মহাজ্ঞানীরা বলেছেন, তোমার মধ্যে যদি সংকল্প আর বিশ্বাস না থাকে তাহলে কোথাও পৌঁছোতে পারবে না। নিজেকে জানা বোঝা চেনা সবসময় জরুরি।

সেজন্যেই তাঁরা বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখা চাই তোমার পরিচিতি যাই-ই হোক। পূর্ণ আস্থা নিজের উপর রেখে এগোতে হবে লক্ষ্যের দিকে। আর যদি আত্মবিশ্বাস বস্তুটার অনটন থাকে তাহলে তোমার ধর্মবিশ্বাস যত প্রবলই হোক কোনও কাজের কাজ হবে না।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

খাদ্যাভ্যাসই ঠিক করে

প্রসূতির খাদ্যাভ্যাসই কি ঠিক করে সন্তানের লিঙ্গ? লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির এক জার্নাল বলছে, পশ্চিমে মায়েরা প্রাতঃরাশ ছেঁটে কেবল লো-ফ্যাট খাবার খাচ্ছেন বলেই ছেলের সংখ্যা কমছে। পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি, ই ও বি-১২ সমৃদ্ধ খাবারে নাকি পুত্র-সন্তানের সম্ভাবনা বাড়ে। মায়েদের বেশি করে শস্য ও কলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বৃটিশ গবেষকরা।

কোলেস্টেরল কমাতে চকোলেট

কে বলে চকোলেট খেলে মোটা হয়? ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, কোলেস্টেরল কমাতে চকোলেটের জুড়ি নেই। এছাড়া নিয়মিত চকোলেট খেলে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে আসে। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত ‘জার্নাল অব্ নিউট্রিশন’এ এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, শুধু চকোলেটই নয়, কোকো এবং অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মেশানো ভেষজ স্টেরলই কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

বুদ্ধিধররাই বাঁচেন বেশি

পরমায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কের গভীর সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন ইতালির ক্যালিব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। পঁচিশের বেশি নারী পুরুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, সাধারণ বুদ্ধির মানুষের থেকে অন্তত ১৫ বছর বেশি বাঁচেন প্রখর বুদ্ধিধররা; সমৃদ্ধ মস্তিষ্কের ক্ষয় হয় ধীরে।

মাতৃঋণ

ক্যান্সারে ভুগছিলেন গর্ভবতী মিশেল স্টেপনি। চিকিৎসকেরা গর্ভপাতের পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজি হননি মিশেল। অশেষ যন্ত্রণা সয়ে অবশেষে জন্ম দেন তিনি নাদুসনুদুস দু’টি কন্যা। দুনিয়ার আলো দেখার তাগিদে মাতৃগর্ভে তারা যে পরিমাণ ধাক্কা দিত, তাতেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় মায়ের ক্যান্সারদুষ্ট টিউমার। ওই যমজ কন্যাই মাকে মারণ-রোগ থেকে নিষ্কৃতি দিল। চমৎকৃত লন্ডনের চিকিৎসকেরা মিশেলকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়েছেন।

পাখি কেন গায়

বসন্তেই কেন গান ধরে কোকিল, দোয়েল, ময়না? ‘নেচার’ জার্নালে গবেষক পিটার শাপ লিখেছেন, বসন্তে দিন বড়, আলো বেশি। এই ঋতুই পাখিদের বার্তা পাঠায় তাদের মস্তিষ্ক কোষে। বার্তা পেয়েই তারা সঙ্গীর খোঁজে বের হয়। মনের মতো সঙ্গী পেতেই পাখিদের এত গান।

রঙ্গকৌতুক

ফাঁসুড়ে : কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার ফাঁসি হয়ে যাবে। আপনার শেষ ইচ্ছে কী?

আসামী : যোগাসন করতে করতে মরতে চাই— হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ অবস্থায়।

***

—মাসিমা, ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’র চাঁদাটা দেবেন, পাড়ার মেয়েদের চকোলেট খাওয়াব!

—সে কী! মেয়েরা যে ওপাড়ার ছেলেদের চকোলেট খাওয়াবার চাঁদা নিয়ে গেল!

***

শিক্ষক : নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা বল্।

ছাত্র : স্যর, পুরোটা মনে নেই, শেষের দিকটা বলি?

শিক্ষক : তাই বল!

ছাত্র : এবং এটাই হলো নিউটনের তৃতীয় সূত্র।

***

প্রশ্ন : কল থেকে জল পড়ার শব্দের শুদ্ধ বাংলা কী হবে?

উত্তর : কলরব!

***

শিক্ষক : চারটে পেয়ারা পাঁচজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারবি?

ছাত্র : হ্যাঁ স্যর। পেয়ারাগুলো দিয়ে জেলি বানিয়ে ফেল্লেই হবে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। বাবার দেওয়া নাম ‘গন্ধর্বনারায়ণ’। সহপাঠীরা ডাকতো ‘থুথুগন্ধ’ বলে। বড় হয়ে একটি নাটক লিখে যশস্বী হন। কে তিনি, ওই নাটকের নাম কী?

২। স্প্যানিশ ফুটবলে এক মরশুমে ৫০ গোলের নজির গড়েন কে?

৩। গোয়েন্দা ‘পরাশর বর্মা’ কার সৃষ্টি?—সত্যজিৎ রায়/শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়/প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৪। একমাত্র একটি ফলের বীজই ফলের বাইরে থাকে। কোন্ ফল?

৫। কত খৃস্টাব্দে এবং কত বঙ্গাব্দে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ হয়?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। দীনবন্ধু মিত্র; নীলদর্পণ ২। লিওনেল মেসি ৩। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪। স্ট্রবেরি ৫। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে; ১১৭৬ বঙ্গাব্দ।

সংস্কৃত কথোপকথনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

হালিশহরে সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ। মঞ্চে দীনেশজী, বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী, স্বামী বিমলানন্দ, ভাস্কর নাথ ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণগোপাল অধিকারী (ইনসেটে)। নীচে শিক্ষার্থীরা

বাসুদেব পাল॥ '' 'সংস্কৃত' ভাষাকে উপেক্ষার জন্যই উর্দু, আরবী, ফার্সী ভাষার বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, পড়েছে। মিশ্র ভাষা তৈরি হচ্ছে। অথচ বিদেশে সংস্কৃত ভাষার রীতিমতো চর্চা হচ্ছে। আমি সংস্কৃত জানি বলেই শুদ্ধ হিন্দী বলতে পারি। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এ পি জে আব্দুল কালাম যখন গ্রীস দেশে গিয়েছিলেন তখন গ্রীসের রাষ্ট্রপতি তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় অভ্যর্থনা করেছিলেন। গ্রীক রাষ্ট্রপতি স্বদেশের প্রাচীন গ্রীক ভাষা শিখতে যখন জার্মানীতে গিয়েছিলেন তখন শিক্ষকরা তাঁকে আগে সংস্কৃত ভাষা শেখার কথা বলেছিলেন। সেজন্য 'সংস্কৃত' যেমন সকল ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা তেমনই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারও মূল সংস্কৃত।" উপরোক্ত বক্তব্য 'সংস্কৃত' প্রচারে সতত প্রয়াসরত 'সংস্কৃত ভারতী'র সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশজী কামথের। গত ৩০ জুলাই হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমে 'সংস্কৃত ভারতী', দক্ষিণবঙ্গ কর্তৃক আয়োজিত দশদিন ব্যাপী সংস্কৃত কথোপকথন শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধ ভাষা। যখন পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখনও কিন্তু সংস্কৃত ভাষা স্বমহিমায় ভারতবর্ষে এবং বিদেশে বিদ্যমান। পাণিনি রচিত ব্যকরণ হাজার বছর ধরে অবিকৃত। একই ব্যকরণ ও বর্ণমালা আছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষারও। সংস্কৃত সর্বসাধারণ ভারতবাসীর মুখের ভাষা। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য জানালেন, তার বাড়ির ৪২ জনই সংস্কৃতেই যাবতীয় কথাবার্তা বলেন। মাত্র তিরিশ বছর আগে ভারতবর্ষে নতুন করে 'সংস্কৃত ভারতী' কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে ভারতে ১৪টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১৫তম বিশ্ববিদ্যালয় অসমে তৈরি হচ্ছে। সংস্কৃতে অসীম জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমান। ৪৫ লক্ষ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। ৫০০০ জন সংস্কৃতে পি এইচ ডি করেছেন। আমেরিকার 'ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনলজি'-তে সংস্কৃত আবশ্যিক পাঠ্য। ভাষাশিক্ষা আগে, ব্যাকরণ পরে। এদেশে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই এই হাল।' সংস্কৃতভারতী শীঘ্রই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সরল সংস্কৃত শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চলেছে বলে শ্রী কামথ ঘোষণা করেন— 'বদতু সংস্কৃতম্, জয়তু ভারতম্'।

এদিনকার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে এজীবনেই সংস্কৃতের জন্য কিছু করে যেতে আহ্বান জানান। বিশিষ্ট অতিথি শিবপুর বিজ্ঞান ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী ভারতবর্ষের উত্থানের জন্য সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানান। বর্গাধিকারীর প্রতিবেদন পেশ করেন অধ্যাপক ড. কৃষ্ণগোপাল অধিকারী।

বর্গে উত্তরবঙ্গ থেকে ২২ জন সহ মোট ১১৮ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হালিশহর মঠের স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী পৌরোহিত্য করেন। মঠের ব্যবস্থাপনায় বর্গ সুসম্পন্ন হওয়ায় সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বর্গের শিক্ষক স্বপন বিশ্বাস সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বি. এম. এসের সেমিনার

গত ২৩ জুলাই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটিকে এ বছর সর্বভারতীয় স্তরে 'দুর্নীতি-বিরোধী দিবস' হিসাবে পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সারা দেশের সঙ্গে বি এম এস পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটিও দিনটিকে দুর্নীতি বিরোধী দিবস হিসাবে যথাযথভাবে পালন করে। এই উদ্দেশ্যে এদিন প্রদেশের মানিকতলাস্থিত 'নরেশ ভবনে' এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনারের বিষয় ছিল ''দুর্নীতির বিরোধিতা করা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার"। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সি কে সাজিনারায়ণ, সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যোৎ মৈত্র এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জিষ্ণু বসু। সভার সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ সভাপতি প্রিয়ব্রত দত্ত।

প্রারম্ভিক ভাষণে প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দে বলেন, দুর্নীতি কেবল ব্যক্তিগত আর্থিক অনিয়ম নয়। রাষ্ট্রীয় স্তরে মনমোহন সরকার যে সমস্ত জাতীয় অর্থনীতি বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন, সেগুলিও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি।

জিষ্ণু বসু ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে কংগ্রেসের ধারাবাহিক দুর্নীতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন।

শ্রী সাজিনারায়ণ প্রাচীন ভারতের সুষম সাংস্কৃতিক জীবনশৈলীর এক সাবলীল বর্ণনা দিয়ে বলেন, স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার এই প্রাচীন জীবনশৈলী শুরু থেকেই ধ্বংস করার ব্রত নিয়েছে। আজকের ধারাবাহিক দুর্নীতি এই কংগ্রেসী কূটনীতিরই ফল। সভার সভাপতি প্রিয়ব্রত দত্ত সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণার আগে দুর্নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন বর্গ

সমাবেশ সমাচার

গত ৮ থেকে ২২ জুন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ বর্গ হলো। শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের ১২টি জেলা থেকে শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন। অসম, মরারাষ্ট্র ও ওড়িশা থেকে শিক্ষিকারা এসেছিলেন। বর্গ উদ্বোধন করেন উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা উৎসা চক্রবর্তী। বর্গের কার্যবাহিকা ছিলেন কৃষ্ণা বিশ্বাস ও সর্বাধিকারী ছিলেন কল্পনা সাহা। বর্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অধিকারী অখিল ভারতীয় প্রমুখ কার্যবাহিকা শান্তা আক্কা ও পূর্ব ক্ষেত্রের কার্যবাহিকা মহুয়া ধর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রান্তের সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী, সহ- কার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার, সম্পর্ক প্রমুখ রেখা পাল, সাংবাদিক কাকলী দাস, উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের রীনা সেন চৌধুরী, অভিভাবিকা বন্দনা রায়, মালদা জেলা কার্যবাহিকা নীতা সাহা, উত্তর দিনাজপুর জেলা কার্যবাহিকা আরতি দেবনাথ প্রমুখ। সমারোপের মুখ্য বক্তা ছিলেন শান্তা আক্কা ও অধ্যক্ষা ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা প্রতিমা দাস।

সর্বনাশা সিদ্ধান্ত

গত ১০.৬.১১ সন্ধ্যা ৭টায় ডিডি বাংলায় সংবাদ এবং ১১.৬.১১ বর্তমান পত্রিকায় ৯ এর পাতায় প্রকাশিত সংবাদ—

অনুমোদনহীন ১০.৫০০ মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা।

দীর্ঘদিন যাবৎ শুনে আসছি— সীমান্তবর্তী জেলাগুলি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের স্বর্গরাজ্য। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ওইসব অঞ্চলে ১০ হাজারের বেশী বে-আইনি মাদ্রাসা ও মসজিদ গজিয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্য সরকারকে বারবার ওইসব বে-আইনি মাদ্রাসাগুলির উপর কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষায় নবদিগন্ত উদ্ভাসিত। বাকী ছিল ওই বে-আইনি ১০ হাজার মাদ্রাসা। তাহলে কি এবার ওই ১০ হাজারের বেশী বে-আইনি মাদ্রাসাকে আইনি মর্যাদা দেওয়া হবে? এটা করা হলে দেশের নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবে বিঘ্নিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বে-আইনি মাদ্রাসাকে আইনি করার সঙ্গে দেশের উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নাই। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাধারণ স্কুল কি যথেষ্ট নয়? বে-আইনি মাদ্রাসাকে আইনি করার কি প্রয়োজন?

অবশ্য নির্বাচনের আগে, যদি কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে, যার ফলে ক্ষমতায় আসীন হবার মাত্র ২২ দিনের মাথায় এই হঠকারী সিদ্ধান্ত— তাহলে জানবো এটা আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, নিবেদিতা পার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা—১১১।

গঙ্গার জল

স্বস্তিকা ২৫ জুলাই (৪৫ সংখ্যায়) ব্রহ্মপুত্রের জল লুঠের চীনের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার বর্ণনা পেলাম। ভারতে গঙ্গার জল লুঠ হচ্ছে না? ১৯৪৭ সনে দক্ষিণেশ্বরে বালি ব্রিজের উত্তরে গঙ্গায় Sea Plane নিয়মিত উঠানামা করতে দেখেছি। প্রায় রোজই গঙ্গায় সাঁতার কাটতাম। এখন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার মাঝ পর্যন্ত হেঁটেই যাওয়া যায়। এত পলি জমেছে প্রবাহ কমেছে বলে। উত্তর ভারতে খাল কেটে চাষের জন্য কত জল

নিচ্ছে তা কখনও প্রকাশ পায় না। ১৯৫২ সালে নির্বাচনী সভায় মেঘনাদ সাহার মুখে (পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন) এ বিষয় শুনেছি। কিন্তু বিধান রায় থেকে জ্যোতি বোস কেউ এ বিষয় কিছু বলেছেন বলে জানা নেই। নদীর প্রবাহ একটি জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জলাভাবে গঙ্গার এত দুরবস্থা যে কলকাতা বন্দরের ইন্তেকাল হয়ে গেছে— এখন হলদিয়া বন্দরও অনেক পলি জমে অকেজো হয়ে গেছে। এ বিষয় তথ্যসহ রচনা প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

আশ্চর্য গঙ্গার জন্য স্বামী নিগমানন্দ ১১৪ দিন অনশন করে প্রাণ দিলেন—স্থবির সরকার নীরব। নদীর প্রবাহ রোধ নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতেও দরবার চলে।

—ভূপতিচরণ দে, কলকাতা-৭৫।

বাসভাড়া

সম্প্রতি ভারত সরকার ডিজেলের দাম লিটার প্রতি তিন টাকা বাড়িয়েছেন। তার ফলে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি ইত্যাদির মালিকগণ বাসভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন। না বাড়লে তাঁরা প্রথমে প্রতীক ধর্মঘট ও পরে অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন। একবার প্রতীক ধর্মঘট হয়েও গেছে। প্রতি বছরই একবার বা দুবার ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয় ও এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন ওঠে।

আমার মনে হয় বাসযাত্রীর থেকে একজন কস্ট অ্যাকাউন্টেট ও পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, মালিকদের পক্ষ থেকে একজন কস্ট অ্যাকাউন্টেট ও সরকার পক্ষ থেকে একজন কস্ট অ্যাকাউন্টেট ও পাঁচজন আধিকারিক নিয়ে গঠিত হোক ভাড়া নির্ধারক কনিশন। তাঁরা বর্তমান ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারণ করবেনই, পরবর্তী সময়েও প্রতি এক টাকায় বা কত টাকা ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হলে কিভাবে কোন স্টেজে কিভাবে ভাড়া বৃদ্ধি হবে তার নির্দেশ দিবেন।

—হৃষীকেশ কর, বি বি ১৭৯, সল্টলেক কল—৬৪।

দশরথ-কন্যা

'নবাঙ্কুর' বিভাগে (স্বস্তিকা, ২৭.৬.১১) নির্মল কর বলেছেন, লোমপাদ মুনির সঙ্গে রাজা দশরথের কন্যা শান্তার বিয়ে হয়েছিল। কথাটি ঠিক নয়। রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়ণ সূত্রে জানা যায়, বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ নিজ কন্যা শান্তার বিয়ে দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র ভট্টচার্য-কৃত গদ্যানুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণও বলছে— রাজা লোমপাদ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত 'তনয়া' শান্তার বিবাহ দেন। (দ্রঃ বালকাণ্ড, নবম সর্গ)। রামায়ণের কোনও কাণ্ডের কোন সর্গে শান্তাকে দশরথের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীকর তা জানালে উপকৃত হব। অবশ্য, অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পৌরাণিকা' গ্রন্থে বলেছেন, দশরথ কৌশল্যার মেয়ে শান্তা দশরথের বন্ধু সন্তানহীন রাজা লোমপাদের প্রাসাদে প্রতিপালিতা হয়েছিল। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন।

শ্রীকর বলেছেন, রাজা দশরথের দশ সহস্র রানি ছিলেন। এর আগে, 'রাজা দশরথ' বিষয়ক একটি নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২৬.১০.০৯) নন্দলাল ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন— রাজা দশরথের ৩৫৩ জন স্ত্রী ছিল। শ্রী ভট্টাচার্যের ৩৫৩ সংখ্যার একটি ভিত্তি ছিল; শ্রীকরের 'দশ সহস্র'-এর ভিত্তি অনুক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দশরথের পত্নী-সংখ্যা নিয়ে শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'রামায়ণ কথা' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করে বলেছেন, দশরথের তিন জন পত্নী ছিল; এবং তৎসহ মন্তব্য করেছেন—"মনে হয় দশরথের শত শত পত্নীত্বের অপবাদটা আসলে রামায়ণ পাঠে আমাদের অজ্ঞানতা এবং ভুল অর্থবোধের উপর গড়ে উঠেছে। ব্যাকরণের ভূত এমনি করে অনেক সময় অর্থবোধে বিপত্তি ঘটায়"। নন্দলাল ভট্টাচার্যের উক্ত নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অমলেশ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ ভিত্তি করে আমি 'দশরথ ও তিন রানি' শীর্ষক পত্রে (স্বস্তিকা, ২৩.১১.০৯) বিষয়টি পর্যালোচনা করেছিলাম।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে আলোড়িত 'তোতারাম'

বিকাশ ভট্টাচার্য

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এক সন্ধ্যায় সমীক্ষণ প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'তোতারাম' দেখেছিলাম। মনে দাগ কেটেছিল। কোনও গিমিক নেই, নেই উচ্চকিত নাটকের সংলাপ। খুব সরল সাদামাটা ভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু হাসির মোড়কে এক অমোঘ সত্য নাট্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পঁচিশ বছর পরে এই সেদিন একাডেমিতে আবার ওই একই নাটক দেখার সুযোগ হলো। একটা নাটকের ৩১৭তম রজনী। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম এখনও কি টানটান নাটক। কমেডির আড়ালে জীবনের সত্যকে কেমন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। একবার এক সাক্ষাৎকার নিতে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রাণিকুঠির ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আমার লেখার ইচ্ছের একটা অন্যতম কারণ হলো প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে নিজস্ব পথে চলার তাড়না।... আমি এজন্যই লিখি যাতে বলতে পারি—My theatre is a new knock on the door...' তিনি আরও বলেছিলেন, 'মানুষের কল্যাণকে উপেক্ষা করে যে লেখা তা বিবেকহীন বিভ্রান্তি। আমি বুঝি, আমি এমন ক্ষমতাবান লেখক নই যে আমার লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের দুরবস্থা বদলে দিতে পারব। তাই বলে কর্তব্যই বা ভুলি কি করে? তাই আমি সীমিত ক্ষমতা নিয়েও লিখে যেতে চাই মানুষের হয়ে, মানুষের জন্যে...' তাই তাঁর তোতারাম নাটকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মহত্ত্বের

'তোতারাম' নাটকের একটি দৃশ্য।

যে জয়গান রয়েছে তা পৃথিবীর সমস্ত আদর্শের চেয়ে প্রাচীন এবং মহৎ। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। মানুষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে একজন তোতারাম। অবাঞ্ছিত লোভ আর শ্রমহীন আয়ের পেছনে ছুটে চলা তোতারাম শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ভেঙ্গে আলোর পথে এগিয়ে যায়। এইভাবেই নাট্যকার তাঁর তোতারাম নাটকে মানুষের অন্তরের মানুষকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার অপরাজেয়তাকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন।

আর এই গভীর কথাটি তিনি বলেছেন আগাগোড়া কমেডির মোড়কে। আর এই কমেডি নির্দেশক-অভিনেতা পঙ্কজ মুন্সীর মুন্সীয়ানায় আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ৩১৭ রজনী ২৫ বছর ধরে তিনি তোতারাম চরিত্রকে মঞ্চে মূর্ত করে তুলছেন। বয়স বেড়েছে, কিন্তু অবসাদ বা ক্লান্তির তাঁকে ছুঁতে পারেনি। এ নাটকে আর এক সম্পদ এর গান। শ্যামাসঙ্গীত, পদাবলী কীর্তন, নানা লোকগান এবং সুর এনে তিনি এ নাটকের লোকায়ত মেজাজকে ভাষা দিয়েছেন। মঞ্চভাবনা ও গানের সুর তাঁরই। অন্যান্য ভূমিকায় কল্যাণ ঘোষ, শান্তু মুখার্জী, আম্রপালি ঘোষ, তপতী মুন্সী যথাযথ। গ্রামের মেয়ে চম্পার ভূমিকায় সহজিয়া ছন্দটি ফুটিয়ে তুলেছেন কমলিকা চ্যাটার্জী। কর্পোরেট বদান্যতা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রান্ট ছাড়া আজকের দিনে নাটক করে যাওয়া অচিন্ত্যনীয়। এই দুই-এর সাহায্য ছাড়া দিনের পর দিন—৩১৭ রজনী ধরে নাটক করে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। তবু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে চলেছে সমীক্ষণ আর তার কলাকুশলীবৃন্দ। এই জন্যই এদের এই নীরব প্রয়াস, নাটকের জন্য তাদের আন্তরিকতা, নিরবচ্ছিন্ন পথ চলা সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করলাম। বাংলা নাটক আজও বেঁচে আছে— এইসব 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' কিছু মানুষের জন্য। সমীক্ষণের শিল্পীরা আজও সরকারি স্যালারী গ্রান্ট, প্রোডাকশন গ্র্যান্ট বা বিগ কর্পোরেট হাউসের স্পনসরশিপ ছাড়াও দিনের পর দিন নাটক করে চলেছেন— নাটকের মধ্যেই বেঁচে আছেন।

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১৫

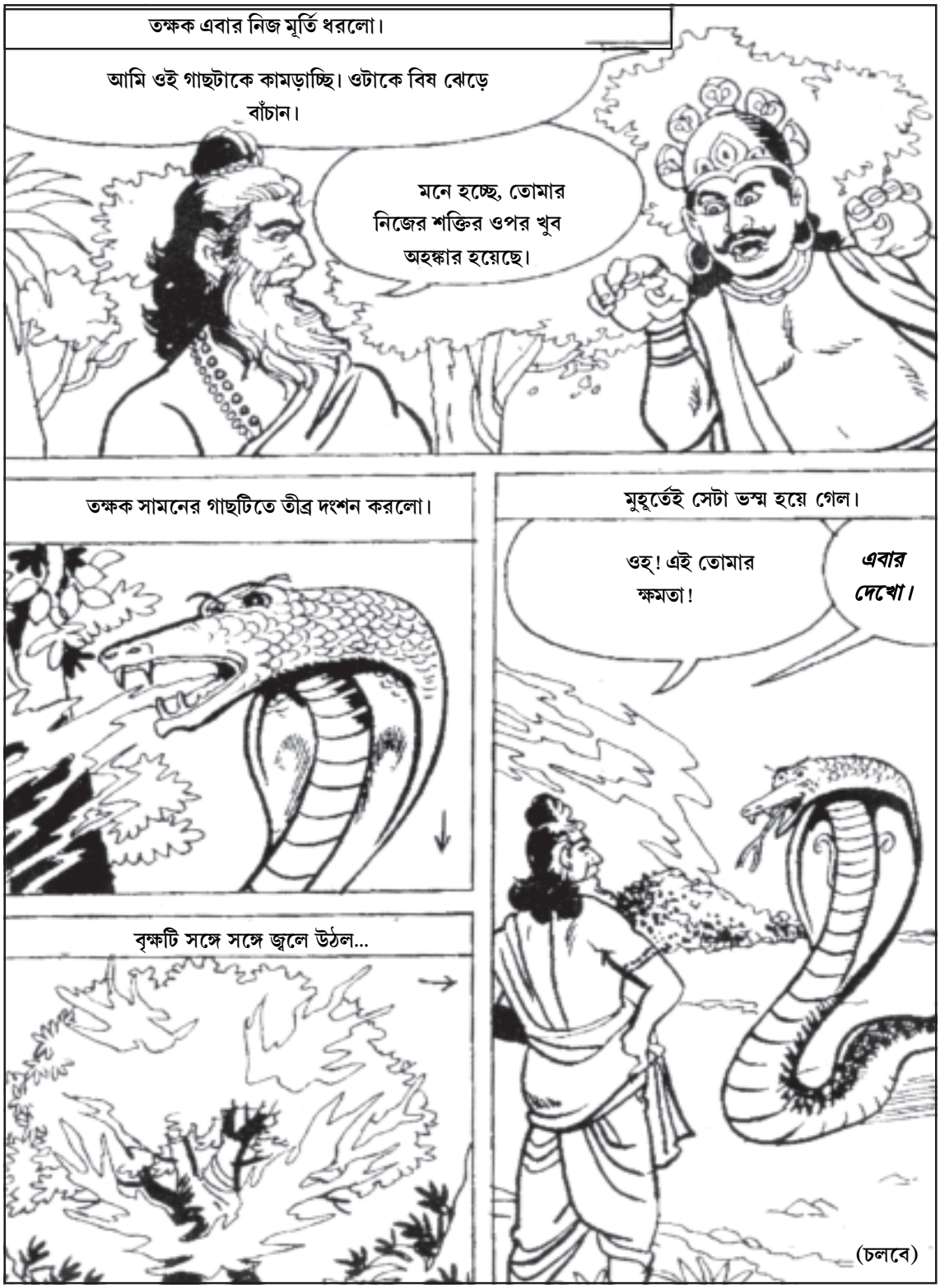

Swastika RNI No. 5257/57
15 August - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম : ৫.০০ টাকা